জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা

কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা

মূলঃ

শায়েখ সালেহ্ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়েখ

অনুবাদঃ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

দারুসসালাম

Supervised by

Abdul Malik Mujahid

First Edition: December 2004

HEAD OFFICE

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A.Tel: 00966-01-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: riyadh@dar-us-salam.com, darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:
Riyadh
Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel 4735220 Fax: 4735221

- **Jeddah**
  Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
  Madinah
  Tel: 00966-4-815-1121 Fax: 815 1121
- **Al-Khobar**
  Tel: 00966-3-8692900 Fax: 00966-3-8691551

U.A.E

- **Darussalam, Sharjah U.A.E**
  Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624
  Sharjah@dar-us-salam.com

PAKISTAN

- **Darussalam,** 36 B Lower Mall, Lahore
  Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072
  Lahore@dar-us-salam.com
- Rahman Market, Ghazni Street
  Urdu Bazar Lahore
  Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703

U.S.A

- **Darussalam, Houston**
  P.O Box: 79194 Tx 77279
  Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
  E-mail: sales@dar-us-salam. Com.
- **Darussalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn
  New York-11217, Tel: 001-718-625 5925
  Fax: 718-625 1511
  Email: newyork@dar-us-salam.com.

U.K

- **Darussalam International Publications Ltd.**
  Leyton Business Centre
  Unit – 17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT
  Tel: 00 44 20 8539 4885 Fax: 00 44 20 8539 4889
  Mobile: 00 44 7947 306 706
- **Darussalam International Publications Limited**
  146 Park Road,
  London NW8 7RG Tel: 00 44 20 725 2246
- **Darussalam**
  398-400 Coventry Road, Small Heath
  Birmingham, B10 0UF
  Tel: 0121 77204792 Fax: 0121 772 4345
  E-mail: info@darussalamuk.com
  Web: www.darussalamuk.com

HONG KONG

- **Peacetech**
  A2, 4/F Tsim Sha Tsui Mansion
  83-87 Nathan Road Tsimsbatsui
  Kowloon, Hong Kong
  Tel: 00852 2369 2722 Fax: 00852 2369 2944
  Mobile: 00852 97123624

MALAYSIA

Darussalam International Publications Ltd.
No.109 A Jalan SS 21/A, Damansara Utama
47400, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 00603 7710 9750 Fax: 603 7710 0749

FRANCE

- Editions & Librairie Essalam
  135, Bd de Ménilmontant- 75011 Paris
  Tél: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83
  Fax: 0033-01- 43 57 44 31
  E-mail: essalam@wanadoo.FR

AUSTRALIA

- ICIS: Ground Floor 165-171, Haldon St.
  Lakemba NSW 2195, Australia
  Tel: 00612 9758 4040 Fax: 9758 4030

SINGAPORE

- Muslim Converts Association of Singapore
  32 Onan Road The Galaxy Singapore- 424484
  Tel: 0065-440 6924, 348 8344
  Fax: 440 6724

SRI LANKA

- Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4
  Tel: 0094-1-589 038 Fax: 0094-74 722433

KUWAIT

- Islam Presentation Committee
  Enlightment Book Shop
  P.O. Box: 1613, Safat 13017 Kuwait
  Tel: 00965-244 7526, Fax: 240 0057

SOUTH AFRICA

- Islamic Da'wah Movement (IDM)
  48009 Qualbert 4078 Durban,South Africa
  Tel: 0027-31-304-6883
  Fax: 0027-31-305-1292
  E-mail: idm@ion.co.za

غاية المريد في شرح كتاب التوحيد
(باللغة البنغالية)

জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা

কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা

মূলঃ
শায়েখ সালেহ্ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্‌রাহীম আলে শায়েখ

অনুবাদঃ
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সৌদি আরব

দা রু স সা লা ম
রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

অনুবাদকের আরয

সকল প্রশংসা সমস্ত জগতের অধিপতি একক-অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী ও রাসূলের ইমাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি। যিনি এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাদের প্রতি, যারা এই তাওহীদকে বাস্ত বায়ন ও এর উপর অটল থাকার ক্ষেত্রে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করেছেন।

বিপ্লবী সংস্কারক শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্ তামীমী (রাহিমাহুল্লাহ) এর বহুল প্রসিদ্ধ তাওহীদের উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত **"কিতাবুত তাওহীদ"** নামক গ্রন্থটির এ পর্যন্ত অর্ধ ডজনের অধিক শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার সর্বশেষ যে ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো, বর্তমান সৌদি সরকারের মাননীয় ধর্মমন্ত্রী আল্লামা শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে-শায়েখ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ **"গায়াতুল মুরীদ ফি শারহে কিতাবিত তাওহীদ"**। যার বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে **"জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা"** যদিও ইতিপূর্বে এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটির অন্যান্য জীবন্ত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় কিছু বিলম্বে হলেও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নানা প্রতিকুলতার বাঁধ ভেঙ্গে আলোর পরশ পেলো, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় পাঠক!

তাওহীদ বা আল্লাহকে একক স্বীকৃতি ও যাবতীয় শিরক থেকে মুক্ত হওয়াই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ বর্তমান সমাজ বিষয়টি সম্পর্কে সর্বাধিক উদাসীন। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন মহাগ্রন্থাদী আর তাওহীদপন্থী-একত্ববাদীদের জন্যই তৈরি করেন জান্নাত ও এর পরিপন্থীদের জন্য তৈরি করেন জাহান্নাম। তাই তো প্রত্যেক নবী-রাসূলের জীবন চরীতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁরা অন্য যে কোন ইবাদত, আমল ও কর্মসূচীর পূর্বে তাওহীদকে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জীবন দিয়েছেন ও বিপর্যস্ত হয়েছেন কিন্তু তাওহীদের পরিপন্থী শিরকের সাথে আপোস করেননি। তাই

আজও প্রত্যেক অরাসাতুল আম্বিয়া-নবীদের উত্তরসূরী আলেম-ইমাম, খতীব, বক্তা, সংস্থা, সংগঠন, জামাত ও দলের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো প্রচার ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে তাওহীদকে অগ্রাধিকার ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

শায়েখ মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিছক কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীনের আকীদার আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর "কিতাবুত তাওহীদ" এ আলোকপাত করেছেন। আর উক্ত কিতাবের অন্যান্য বহু মনীষীর ন্যায় শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে শায়েখ (হাফিজাহুল্লাহ) অতিপ্রাঞ্জল, বোধগম্য ব্যাপকভাব সমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এই অসাধারণ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ লাভ করায় আমি আল্লাহর নিকট জানাই অজুত সিজদায়ে শুকর। যারা এর পেছনে শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ যেন সবার শ্রমকে কবূল করেন ও এটিকে আমাদের নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, এ অসাধারণ বইটির কোথাও ভুল পরিলক্ষিত হলে দারুস সালাম-এর সদর দফতরে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে। ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম।

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
১০/১০/১৪২৫ হিঃ
২৪/১০/২০০৪ খ্রিঃ

প্রকাশকের আরজ

তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তি। আর এ মূল ভিত্তি যদি স্বীয় হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে আকীদা ও ইবাদতসহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক সার্বিক জীবন ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হবে। চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ তাওহীদের সূর্য উদয় হয় আরব মরুভূমিতে লাত, মানাত ও হুবলসহ সমস্ত পৌত্তলিকতার অন্তিম সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে। যার ফলে শিরক, কুফর, গোমরাহী, বিদ'আত, কুসংস্কার ও যাবতীয় পাপাচারের ক্ষেত্রসমূহ বিরানে পরিণত হয়। এ সবের স্থান দখল করে ঈমান-ইয়াকীন ও তাওহীদ। যার ফলে ইসলাম স্বীয় শক্তি বিস্তার করে বিশ্বে জনপ্রিয়তা ও সর্বজনীনতা লাভ করে।

তাওহীদ হলো বিশ্বজগতের প্রতি সমস্ত নবী ও রাসূলের ছেড়ে যাওয়া অমূল্য আমানত। যা খতমে নবুওয়্যাতের বরকতে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে স্থান দখল করার ফলে উম্মাত ইলম, আমল, ইখলাস ও তাকওয়ার পোশাকে সুশোভিত হয়।

পুনরায় যখন ইউনানী-গ্রীক বাতিল চিন্তা ধারার সাইক্লোন প্রবাহিত হয় এবং উম্মত ধাবিত হয় জাহান্নামের দিকে। আরব জাহানে আরব জাতীয়তাবাদ মাথা জাগালে আল্লাহ তাআলা চেঙ্গিসের আকৃতিতে আযাব পাঠিয়ে দেন। এমতাবস্থায় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)এর তাওহীদি কলম গর্জে ওঠে, তাওহীদের নিশান বুলন্দ হয় ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পায়। পুনরায় আরব ও অনারবে শিরক ও বিদ'আতের সাইক্লোন শুরু হলে ১২শত হিজরীতে আল্লাহ তা'আলা ইমামুদ দাওয়াহ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্ তামীমী (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রেরণ করেন। যার ইলম ও আমলের নিরলস কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টায় নজদ ও হিজাজে তাওহীদী মতবাদ পূর্ণ এক খালেস শরীয়তী জীবন ব্যবস্থা জন্ম নেয়। শিরকের ঘনাঘটা তাওহীদের আলোতে রূপান্তরিত হয়। কবর, দরগাহ, আস্তানা পূজারীদের মূর্তি ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। মাখলুক পরাস্তী ও মাজার পরাস্তীদের দম বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্দিকে তাওহীদের ডঙ্কা বেজে ওঠে ও শিরক বিদ'আত পন্থীরা প্রকম্পিত হয়ে যায়। আর এ আজীমুশ্বান বিপ্লবী সংস্কার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) এর একটি মাত্র গ্রন্থেরই কৃতিত্ব। সে গ্রন্থটি হলো "কিতাবুত তাওহীদ"। আর এই "কিতাবুত তাওহীদ হলো, কুরআন ও হাদীসেরই খালেস নিচড় ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর আদর্শের মূর্তপ্রতীক।

এই অমূল্য অসাধারণ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা হলো বক্ষমান গ্রন্থ **"গায়াতুল মুরীদ ফী শারহে কিতাবিত্ তাওহীদ।"** গ্রন্থটি সংকলন করেন সৌদি আরবের বর্তমান ধর্মমন্ত্রী শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে-শায়েখ।

দারুস সালাম অন্যান্য ভাষাসহ বাংলা ভাষাতেও এই মহা গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। অনুবাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ ও মলাট শিল্পী জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ সহ অন্যান্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ আকৃতিতে জনসাধারণের নিকট পেশ করা সম্ভব হলো, ফলে তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। আল্লাহ যেন সবার সৎশ্রমকে কবূল ও মঞ্জুর করেন। আমীন!

কুরআন ও সুন্নাহর খাদেম

আব্দুল মালেক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুবাদকের কথা v

প্রকাশকের আরজ vii

ভূমিকা o1

০১। তাওহীদ সমস্ত ইবাদতের মূল 03

০২। তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয় 09

০৩। যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে 14

০৪। শিরকের ভয় 19

০৫। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্য বাণীর প্রতি আহ্বান 23

০৬। তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য বাণীর ব্যাখ্যা 29

০৭। বালা-মুসীবতের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য বালা সূতা প্রভৃতি ব্যবহার করা শিরক 34

০৮। যে ব্যক্তি কোন গাছ, পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায় 44

০৯। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা সম্পর্কিত বিষয় 51

১০। যেখানে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হয় সেখানে আল্লাহর নামে জবাই করা যাবে না 57

১১। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক 61

১২। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক 63

১৩। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আর্তনাদ করা অথবা দু'আ করা শিরক 66

১৪। অক্ষমকে আহ্বান করা শিরক 72

১৫। ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহর ওহী অবতরণের ভীতি 77

১৬। শাফায়াত (সুপারিশ) 81

১৭। হিদায়াত দানকারী একমাত্র আল্লাহ..88
১৮। বনী আদমের কুফরী এবং তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার কারণ নেককারদের বেলায় বাড়াবাড়ি করা সম্পর্কিত 92
১৯। নেককার লোকের কবরে আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে যদি কঠোরতা আসে তাহলে নেককার ব্যক্তির ইবাদত করার ক্ষেত্রে কঠোরতা..........98
২০। নেককারদের কবরে বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তির ইবাদত করা হয়..105
২১। মহানবী (ﷺ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ ও শিরকের পথ রুদ্ধকরণ 108
২২। এই উম্মতের কিছু লোক মূর্তি পূজা করে.................................111
২৩। যাদু 118
২৪। যাদুর প্রকারভেদ 124
২৫। গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বর্ণনা..128
২৬। নুশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 132
২৭। কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ 134
২৮। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান.................................139
২৯। নক্ষেত্রের উসীলায় বৃষ্টি কামনা করা 141
৩০। আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা দ্বীনের স্তম্ভ..................................145
৩১। ভয়ভীতি শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য..................................150
৩২। একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা 153
৩৩। আল্লাহ তায়ালার পাকড়ও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়.............156
৩৪। তাকদীরের (ফয়সালার) উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ............159
৩৫। রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান.............................163
৩৬। নিছক পার্থিব স্বার্থে কোনো কাজ করা শিরক 166
৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত

জিনিসকে হালাল করল... রব হিসেবে গ্রহণ করল......................169
৩৮। ঈমানের দাবীদার কতিপয় লোকের অবস্থা 172
৩৯। আল্লাহর 'আসমা ও সিফাত' অস্বীকারকারীর পরিণাম...................176
৪০। আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম 179
৪১। শিরকের কতিপয় গোপনীয় অবস্থা..182
৪২। আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম 186
৪৩। আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন বলার হুকুম...............................187
৪৪। যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয় 191
৪৫। কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক, প্রভৃতি) নামকরণ প্রসঙ্গ 193
৪৬। আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্মানার্থে নামের
পরিবর্তন করা 195
৪৭। আল্লাহ, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে
খেল-তামাশা করা...197
৪৮। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের নাশোকরী করা অহংকারের লক্ষণও
অনেক বড় অপরাধ 199
৪৯। সন্তানাদি পাওয়ার পর আল্লাহর সাথে অংশীদার করা 205
৫০। আসমাউল হুসনা-এর বর্ণনা 208
৫১। আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক বলা যাবে না 210
৫২। হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো 212
৫৩। আমার দাস-দাসী বলা যাবে না 214
৫৪। আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা 216
৫৫। 'বি ওয়াজহিল্লাহ' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই
প্রার্থনা করা যায় না 218
৫৬। বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা......................................219

৫৭। বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ..221
৫৮। আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা সম্পর্কে খারাপ ধারণার নিষিদ্ধতা...........223
৫৯। তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিচিতি..227
৬০। ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম 232
৬১। অধিক কছম খাওয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান.............................236
৬২। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিষয় 240
৬৩। আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি 244
৬৪। আল্লাহর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির নিকট সুপারিশ কামনা হারাম 246
৬৫। রাসূল (ﷺ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন......248
৬৬। আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব এবং উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা..........................251

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

তাওহীদপন্থী আলেমগণ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, ইসলামে এই কিতাবুত্ তাওহীদ-এর মতো আর কোন গ্রন্থ এ বিষয়ে রচিত হয়নি। এটি একটি দাওয়াতী (প্রচারের) গ্রন্থ। তাওহীদের পথের আহ্বায়ক। কারণ শায়খ (রহমাতুল্লাহি আলাইহ) এতে তাওহীদের মূল প্রমাণ সন্ধী বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের অর্থ ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের বিপরীত কি এবং তার ভয়াবহতা কেমন তা বর্ণনা করেছেন। তাওহীদে এবাদত এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত (আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীতে একত্ববাদ)-এর মৌলিকনীতি-মালা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে বড় শিরক ও সবচেয়ে ছোট শিরকের বর্ণনা এবং সেগুলোর কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটির উপায় ও মাধ্যম বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের সংরক্ষণ এবং কিভাবে তা সম্পন্ন হয় তা বর্ণনা করেছেন। তাওহীদে রুবূবিয়্যার প্রকারও কিছুটা বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থটি (কিতাবুত্ তাওহীদ) অত্যন্ত মহান একটি গ্রন্থ। তাই আপনি এটি মুখস্থ, অধ্যয়ন ও অনুধাবন করলে তা হবে একটি মহৎ কাজ। কারণ, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার এটি দরকার হবে।

কিতাবুত্ তাওহীদঃ তাওহীদ হচ্ছে কোন জিনিসকে এক বলে সাব্যস্থ করা। মুসলিমগণ আল্লাহ্‌কে এক বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, উপাস্যকে তারা এক বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি হচ্ছেন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্। আল্লাহর গ্রন্থে (কুরআনে) কাঙ্ক্ষিত তাওহীদ তিন প্রকারঃ তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ, তাওহীদে উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদে আস্‌মা ওয়াস্‌সিফা।

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহর অর্থ হল, আল্লাহ্‌কে তাঁর কার্যাবলীতে এক বলে সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্‌র কাজ অনেক। তন্মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি করা, জীবিকা দেয়া, জীবিত করা, মৃত্যুদান করা। পরিপূর্ণতার সাথে এগুলোর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্ বা ইলাহিয়্যাহ (শব্দ দুটি أَلَهَ يَأْلَهُ) ক্রিয়ার ক্রিয়ামুল বা মাছদার। এর অর্থঃ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে ইবাদত বা উপাসনা করল এটি হল ; বান্দার কার্যাবলীতে আল্লাহ্‌কে এক বলে সাব্যস্ত করা। তৃতীয় প্রকার তাওহীদ হচ্ছে; তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত। এর অর্থঃ বান্দার একথা বিশ্বাস

করা যে, মহামহিম আল্লাহ্ তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে একক সত্ত্বা, এদু'টিতে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই।

শায়খ (রহমাতুল্লাহি আলাইহ) এ গ্রন্থে তাওহীদের তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন। যে সকল বিষয় মানুষের জন্য অতীব জরুরী এবং যে সকল বিষয়ে তারা কোন বই-পুস্তক পায় না সে সকল বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য যেমন, তাওহীদে উলুহিয়্যাহ এবং ইবাদত তিনি এর প্রকারসমূহ বর্ণনা করেছেন। যথাঃ তাওয়াক্কুল বা ভরসা, ভয়-ভীতি, ভালবাসা... । এটির বিশদ বিবরণ দানের সময় তার বিপরীত বিষয় শিরকেরও বর্ণনা দিয়েছেন। শিরক হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালী মহিয়ান আল্লাহ্র সাথে তাঁর প্রভূত্বে অথবা ইবাদত বন্দেগীতে অথবা নামসমূহ ও গুণাবলীতে অংশীদার সাব্যস্ত করা।[১]

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে, এক বিবেচনায় শিরক দু'ভাগে বিভক্তঃ শিরকে আকবার বা সবয়েচে বড় শিরক ও শিরকে আসগার বা সবচেয়ে ছোট শিরক। আবার এক বিবেচনায় শিরক তিন প্রকারঃ (১) শিরকে আকবার (২) শিরকে আসগার ও (৩) শিরকে খাফী বা গুপ্ত শিরক। শিরকে আকবার ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়। এটি হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে অন্য কারো ইবাদত করা অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদতের কিছুটা হলেও সম্পন্ন করা, অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করা। শিরকে আসগার সেটিই যেটা শরীয়তদাতার বিচারে শিরক বলে গণ্য তবে এটি শিরকে আকবারের মতো তীব্রভাবে নিন্দিত নয়। এই শিরকে আকবারের একটি হচ্ছে প্রকাশ্য। যেমন, মূর্তিপূজকদের শিরক, কবর ও মৃতদের পূজাকারীদের শিরক। অপরটি হচ্ছে গোপন যেমন, মুনাফিকদের (কপটদের) অথবা গুরু, পীর, ফকীরদের অথবা মৃতদের অথবা বিভিন্ন উপাস্যের উপর নির্ভরকারীদের শিরক। এদের শিরকটি গুপ্ত কিন্তু বড়। তবে এটি দৃশ্যতঃ বড় নয় গোপনেই বড়। শিরকে আসগার যেমনঃ বালা, সুতা ও তাবীয ব্যবহার করা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। শিরকে খাফী বা গুপ্ত শিরক হচ্ছে সূক্ষ্ম রিয়াকারী বা দর্শনের ইচ্ছা প্রভৃতি।

১। এ গ্রন্থে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে অংশীদার স্থাপন করতে নিষেধ করা এবং তাঁর একত্ববাদের নির্দেশ দেয়া।

তাওহীদ সমস্ত ইবাদতের মূল

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ "আর আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[১] (সূরা আয্‌যারিয়াতঃ ৫৬)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

অর্থঃ "আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই মর্মে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং 'তাগুত' থেকে দূরে থাক।"[২] (সূরা আন্-নাহ্‌লঃ ৩৬)

১। আল্লাহ্‌র এ বাণীর মর্ম হলঃ আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনিঃ শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। তা হচ্ছে, তারা আমার ইবাদত উপাসনা করবে এ আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে। এর যুক্তি হলোঃ আমাদের পূর্বসূরীগণ (إلاَّ لِيعبُدُونَ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ অর্থাৎ তারা কেবল আমার একত্ববাদে বিশ্বাস করবে। এ ব্যাখ্যার প্রমাণ হলঃ রাসূলগণ কেবল তাওহীদে ইবাদতের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। ইবাদতের উৎপত্তিগত অর্থ হলঃ বিনয়-নম্রতা। এর সাথে ভালবাসা ও আনুগত্য যুক্ত হলে তা হবে শারয়ী ইবাদত। শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের অর্থ হলোঃ ভালোবাসা, আশা ও ভীতির সমন্বয়ে আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। শায়খুল ইসলাম বলেছেন, ইবাদত এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ। অতএব এ আয়াতের মর্ম হবে; সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হওয়া ওয়াজিব; অন্য কারো জন্য নয়।

২। এই আয়াতটি ইবাদত ও তাওহীদের অর্থের ব্যাখ্যা করছে। আরো ব্যাখ্যা করছে রাসূলগণ তার দু'টি বাণীসহ প্রেরিত হয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে; তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং 'তাগুত' থেকে দূরে থাক। এটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মার্থ। اعبدوا الله এ আয়াতাংশে রয়েছে তাওহীদের স্বীকৃতি। واجتنوا الطاغوت শিরকের অস্বীকৃতি। الطاغوت শব্দটি فعلوت এর ওজনে الطغيان থেকে উৎপন্ন। বান্দা তার উপাসনা ও আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে যারই ধর্ণা দেয় তাকেই 'তাগুত' বলা হয়।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন–

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ﴾

অর্থঃ "আর তোমার প্রভূ নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।"[৩] (সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ﴾

অর্থঃ "বলুন, তোমরা এসো, তোমাদের প্রভূ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শোনাই। (তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার করবে না।"[৪] (সূরা আনআমঃ ১৫১-১৫৩)

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ﴾

অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।"[৫] (সূরা আন্-নিসাঃ ৩৬)

৩। وقضى ربك এর অর্থ হলো আদেশ করা ও উপদেশ দেয়া। ألا تعبدوا إلا إيـاه অর্থঃ ইবাদত-বন্দেগীকে তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ কর; অন্যের মধ্যে নয়। এটির নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এটিই হচ্ছে (لا إله إلا الله) এর অর্থ। আয়াতে এটি স্পষ্ট যে, তাওহীদের অর্থ হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইবাদতকে একীভূত করা অথবা (لا إله إلا الله) বাণীটি বাস্তবায়িত করা।

৪। উহ্য বাক্যটি এরূপঃ "বলুন, তোমরা এসো, তোমাদের প্রভূ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শোনাই। তিনি তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। "অর্থাৎ নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে উপদেশ হল শরীয়তের দৃষ্টিতে, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শরীয়তী উপদেশ হল অপরিহার্য নির্দেশ। পূর্বের আয়াতসমূহের মতো এ আয়াতটিও তাওহীদের অর্থ বহন করে।

৫। এ আয়াতে শিরকে আকবার, শিরকে আসগার ও শিরকে খাফী-সকল শিরকের নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া কোন ফেরেশ্‌তা, নবী নেক্‌কার, পাথর, গাছ জ্বিন প্রভৃতির সাথে আল্লাহ্‌র শরীক করার অনুমতি নেই। কারণ ওগুলি সবই ক্ষুদ্র বস্তু।

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মোহরাঙ্কিত উপদেশ প্রত্যক্ষ করতে চায় সে যেন মহান আল্লাহ্র এ বাণী পাঠ করেঃ

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾

অর্থঃ "বলুন তোমরা এসো, তোমাদের প্রভূ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শোনাই। (সেটি হচ্ছে) তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার কর না। আর এটি হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এটি অনুসরণ কর; অন্য সকল পথের অনুসরণ কর না।"[৬] (সূরা আন-'আমঃ ১৫৩)

মুয়ায বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

«كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا» (صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، ح:٢٨٥٦، ٥٩٦٧، ٦٢٦٧ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، ح:٣٠)

৬। ইবনে মাউসদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মোহরাঙ্কিত উপদেশ প্রত্যক্ষ করতে চায় এর তাৎপর্য হল এই যে, যদি নেয়া যায় যে, তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন, এ উপদেশ নামায় সীল মোহর লাগানো হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি খোলা হয়েছে, তাহলে তা হবে এসব আয়াত যাতে দশটি উপদেশ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এ বর্ণনাটি শিরকের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শুরু হওয়া এসকল আয়াতের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত করছে। হাদীসে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার যোগ্য দাবী, প্রথম ও সবচেয়ে বেশি গুরুপূর্ণ দাবী।

“আমি একটি গাধার পিঠে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পেছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুয়ায, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক কি? এবং আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক কি? তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক হল এ যে, তাঁরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না।[৭] আর আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক হল এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না তাকে শাস্তি না দেয়া। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি মানুষকে সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, তাদের সুসংবাদ দিও না, নইলে তারা আমল বিমুখ হয়ে পড়বে।”[৮] (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। জ্বিন ও মানুষের সৃষ্টি রহস্য।

২। ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারণ, এর মধ্যেই রয়েছে বিরোধ।

৩। যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করল না সে ইবাদতই করল না। এতে নিহিত রয়েছে– ﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ﴾ (আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না)-এর অর্থ।

৭। শায়খ বলেন, মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একটি গাধার পিঠে মহানবী (ﷺ)-এর পেছনে বসেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মুয়ায, তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র কি হক এবং আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার কি হক? তিনি বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক হচ্ছে তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।” এ হকটি মহান আল্লাহ্‌র জন্য একটি ওয়াজিব হক। কারণ, কিতাব ও সুন্নত (মহানবীর অনুপম জীবনালেখ্য) বরং সকল রাসূলের আগমন ঘটেছে এ হকের দাবী ও বিবরণ নিয়ে এবং এ জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, বান্দার ওপর সকল ওয়াজিবের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হল এটি।

৮। এরপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক হল এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করে না তাকে শাস্তি না দেয়া। “আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক”-এমন একটি হক আলিমগণের ঐক্যমত্যে যেটি আল্লাহ্‌ নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্‌ তা’আলা নিজপ্রজ্ঞা অনুযায়ী যা চান নিজের জন্য হারাম করেন এবং ওয়াজিব করেন। হাদীসে কুদসীতে তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর যুলুম অবিচারকে হারাম করেছি।”

৪। রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য।

৫। প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরিত হয়েছেন।

৬। সকল নবীর দ্বীন— জীবন ব্যবস্থা এক।

৭। তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পন্ন হবে না। এতেই রয়েছে আল্লাহ্‌র বাণী—

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ﴾

(অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনল সে দৃঢ় বন্ধনকে আঁকড়ে ধরল।)

৮। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যারই ইবাদত করা হয় তাকেই তাগুত বলা হয়।

৯। সালাফে সালেহীনের নিকট সূরায়ে আন্‌'আমের তিনটি সুস্পষ্ট আয়াতের উচ্চ মর্যাদা, যাতে রয়েছে দশটি বিষয়। প্রথমটি হল শিরকের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।

১০। সূরায়ে ইসরার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। এতে রয়েছে আঠারটি বিষয় যা আল্লাহ্ শুরু করেছেন—

﴿لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا﴾

(আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত কর না, নইলে তুমি নিন্দিত লাঞ্ছিত হয়ে বসে থাকবে।)- আর শেষ করেছেন।

﴿وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا﴾

((আর তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।)) দিয়ে এ বিষয়গুলির উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ্ বলেছেন।

﴿ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِ﴾

অর্থাৎ, "এটি এমন হিকমতের অন্তর্ভুক্ত যা আপনার প্রভূ আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করেছেন।

১১। সূরায়ে নিসার আয়াত থেকে ১০টি আয়াতকে অধিকারের আয়াত বলা হয়। আল্লাহ্ এটি শুরু করেছেনঃ

﴿ ۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ﴾

(আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন কর না।)" আয়াত দিয়ে।

১২। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) ইন্তেকালের সময় যে উপদেশ দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে সতর্ক করা।

১৩। আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৪। বান্দা আল্লাহ্‌র হক আদায় করলে সে কি হক বা অধিকার লাভ করবে তা জানা।

১৫। অধিকাংশ সাহাবীই এ বিষয়টি জানতেন না।

১৬। কল্যাণের স্বার্থে এলম গোপন রাখার বৈধতা।

১৭। মুসলমানকে আনন্দদায়ক সুসংবাদ দেয়া মুস্তাহাব।

১৮। আল্লাহ্‌র দয়ার ব্যাপকতার কথা শুনে আমল বিমুখ হয়ে পড়ার আশংকা।

১৯। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যে বিষয়ে না জানে সে বিষয়ে الله ورسوله أعلم (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন।) বলা।

২০। ঢালাওভাবে সকলকে ইলম না শিখিয়ে বিশেষভাবে কতিপয় লোককে শেখানোর বৈধতা।

২১। গাধার পিঠে সফর সঙ্গী করার মাধ্যমে মহানবী (ﷺ)-এর বিনয় প্রকাশ।

২২। জন্তুর পিঠে সফরসঙ্গী করার বৈধতা।

২৩। মুয়ায বিন জাবালের মর্যাদা।

২৪। এই বিষয়টির উচ্চ মর্যাদা।

অধ্যায়-১
তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়।*

মহান আল্লাহ বলেছেন–

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾

অর্থঃ "যারা ঈমান আনবে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম-এর সাথে মিশ্রিত করবে না তাঁদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।"[১] (সূরা আনআমঃ ৮২)

উবাদাহ বিন সামিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

---

*"তাওহীদের মর্যাদা এবং এর ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়" অধ্যায় অর্থাৎ তাওহীদের দ্বারা পাপ মোচন হওয়া। বান্দা যত বেশি পরিমাণে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, ততই তার আমলের গুণে সে জান্নাতের পথে ধাবিত হবে তার আমল যাই হোক না কেন। এই কারণে ইমাম সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূরায়ে আন্‌আমের আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন।

১। আল্লাহ্‌র বাণী-

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾

অর্থঃ যুলম এর অর্থ শিরক, ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে সহীহাইনের হাদীসে এমনই রয়েছে। সাহাবীগণ এখানে এ আয়াতটিকে বিরাট বিষয় ভেবে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাদের মধ্যে কে নিজের প্রতি যুলুম করেনি? তিনি বললেনঃ তোমরা যা বুঝেছ তা নয়; যুলুম হল শিরক। তোমরা কি নেক্‌কার বান্দার (লোকমানের) কথা শুননি (إن الشرك لظلم عظيم) এক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ হবে, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের সাথে কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এটিই হচ্ছে তার ফযীলত বা মর্যাদা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যতটুকু শিরকের মাধ্যমে তাওহীদকে কলুষিত করবে তার নিকট থেকে সে হারেই নিরাপত্তা ও হেদায়াত দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তবায়ন করল এবং শিরকের সাথে তার ঈমানকে কলুষিত করে নাই অর্থাৎ তার তাওহীদকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নাই তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও হেদায়েত।* হাদীসের বর্ণিত মর্মার্থ এই যে, তার অন্য সব পাপ থাকলেও এবং আমলে ত্রুটি করলেও তাওহীদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। এটিই হলো তাওহীদের অনুসারীদের মর্যাদা।

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»(صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالٰى ﴿يٰأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾ ح:٣٤٣٥ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل علٰى أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، ح:٢٨)

“যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং যেটিকে তিনি মারইয়ামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, আর তিনি (ঈসা) তাঁর রূহের অংশ। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য তার আমল যাই হোক না কেন তাকে তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২] (বুখারী ও মুসলিম)

তাদের উদ্ধৃত ইতবান বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ»(صحيح البخاري، الصلاة، باب المساجد في البيوت، ح:٤٢٥، الرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، ح:٦٤٢٣ وصحيح مسلم، المساجد، الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، ح:٢٦٣/ ٣٣)

“আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন যে বলেঃ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এর মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনা করে।”[৩]

২। উবাদাহ বিন সামিত (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। উক্ত হাদীসের শেষ পর্যন্ত, তাঁর অন্য বাণীঃ على ما كان অর্থাৎ “ সে যে আমলের উপরই হোকনা কেন” অর্থাৎ যদিও সে স্বল্প আমলকারী ও অনেক গুনাহ-খাতা করেছে। আর এটিই হল তাওহীদবাদীর প্রতি তাওহীদের অবদান। ইতবানের বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিমে আরো এসেছেঃ فإن الله حرم ... بذلك وجه الله

৩। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এটি হল কালেমায়ে তাওহীদ-তাওহীদের বাণী, আর তাওহীদপন্থী ব্যক্তি যখন তাওহীদের বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, এর শর্তাবলী ও দাবী সমূহ

আবূ সাঈদ খুদরী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

«قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَارَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَامُوْسٰى! لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هٰذَا، قَالَ: يَامُوْسٰى! لَوْ أَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ»(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح:٢٣٢٤ والمستدرك للحاكم:١/٥٢٨ ومسند أبي يعلى الموصلي، ح:١٣٩٣)

মূসা (ﷺ) বলেছিলেন, “হে আল্লাহ্‌ আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যার দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং ডাকব। (আল্লাহ্‌) বলেন, হে মূসা বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌! আপনার সকল বান্দাই তো এরূপ বলে। তিনি বলেন, হে মূসা, সাত আকাশ এবং তাতে আমি ছাড়া যা কিছু আছে এবং সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কে অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে -এর পাল্লাটি ঝুকে পড়বে। ইবনে হিব্বান ও হাকেম এবং তিনি এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

তিরমিযিতে বর্ণিত। তিনি এটিকে হাসান বলেছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ

«قَالَ اللهُ تَعَالٰى: يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»(جامع الترمذي، الدعوات، باب يابن آدم إنك ما دعوتني، ح:٣٥٤٠)

পূরণ করে তখন আল্লাহ্‌ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার সাথে কৃত ওয়াদা অনুযায়ী তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন। এটি একটি বড় অনুগ্রহ।
কিন্তু যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও অন্যান্য পাপ করে তাওবা না করে মারা যাবে তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্‌ চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন এরপর তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। অর্থাৎ শাস্তি ভোগ করার পর আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। তার জন্য প্রথমেই জাহান্নামকে হারাম করে দিতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি আমার নিকট কোন শিরক না করে পৃথিবী ভর্তি পাপ নিয়ে উপস্থিত হও তাহলে আমি তোমার নিকট পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে আসব।[৪]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্র অনুগ্রহের ব্যাপকতা।

২। আল্লাহ্র নিকট তাওহীদের সওয়াবের আধিক্য।

৩। তাওহীদ থাকার কারণে অন্যান্য পাপরাশি মোচন করা।

৪। সূরায়ে আন'আমে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

৫। উবাদার হাদীসে যে পাঁচটি বিষয় রয়েছে তা অনুধাবন করা।

৬। এ হাদীস, ইতবানের হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসকে যদি একত্র কর তাহলে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র অর্থ তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া যারা ধোঁকায় পড়ে আছে তাঁদের ভুলও তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে।

৭। ইতবানের হাদীসে যে শর্ত রয়েছে সে সম্পর্কে সতর্কীকরণ।

৮। নবীগণের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর ফযীলত সম্পর্কে সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা।

৯। সমস্ত সৃষ্টিজীব থেকে কালিমার প্রাধান্যতা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করা অথচ যারা এটি বলে তাঁদের অনেকেরই দাঁড়ি পাল্লা হাল্কা হবে।

৪। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, বান্দার পাপ যদি সাত আকাশ, আকাশে অবস্থিত বান্দা ও ফেরেশতা এবং সাত জমিন পরিমাণ ও হয় তাহলেও সেগুলোর চেয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর পাল্লাটি ভারি হবে। হযরত আনাসের হাদীসেও এটি আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে। কালিমায়ে তাওহীদের এই বিরাট ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য যে একনিষ্ঠ ভাবে নিখাদচিত্তে সত্যিকার অর্থে এটি গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে, এটিকে ভালোবাসে অন্তরে কালেমার ছাপ ও চিহ্ন এবং তার আলো প্রভাবিত করে। যে তাওহীদের স্বরূপ এমন হবে সেটি তাওহীদ বিরোধী সকল পাপকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।

১০। আকাশের মতো জমিন ও সাতটি এ মর্মে প্রমাণ।

১১। এগুলোতেও সৃষ্টজীব রয়েছে।

১২। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সাব্যস্ত করা যা আশ'আরীদের বিরোধী।

১৩। যখন আনাসের হাদীস জানলে ইতবানের হাদীসের মর্মও তাই উপলব্ধি করলে। আর তা হল শিরক পরিত্যাগ করা। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শুধু মুখে বলা নয়।

১৪। ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয়েই আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল- এ কথা অনুধাবন করা।

১৫। ঈসা "কালিমাতুল্লাহ্" উপাধীতে ভূষিত- একথা জানা।

১৬। তিনি আল্লাহ্‌র রূহ- এ কথা জানা।

১৭। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখার ফযীলত জানা।

১৮। على ما كان من العمل এর অর্থ জানা।

১৯। দাঁড়িপাল্লায় দুইটি পাল্লা আছে তা জানা।

২০। হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর وجه, সম্পর্কে জানা, (যার অর্থঃ চেহরা-মুখমণ্ডল, আল্লাহর এ গুণ- চেহারার প্রতি ঈমান রাখতে হবে, তবে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না।)

অধ্যায়-২

যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।*

আল্লাহ্‌র বাণী—

﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম এক জাতি ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র অনুগত ও একমুখী আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[১] (সূরা নাহ্‌লঃ ১২০)

আল্লাহ্‌ বলেছেন—

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "আর যারা তাদের প্রভুর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করে না।"[২] (সূরা আল-মুমিনূনঃ ৫৯)

---

* তাওহীদের বর্ণনার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়টি সর্বোচ্চ স্তরের। কারণ তাওহীদের ফযীলতে তাওহীদপন্থীরাও জড়িত। এই উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাওহীদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়।

১। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (عليه السلام) তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। তার প্রমাণ হল, আল্লাহ্‌ তাকে কয়েকটি গুণে ভূষিত করেছেনঃ **প্রথমতঃ** তিনি এক (أمة জাতি) ছিলেন। উম্মাত হচ্ছেন সেই ইমাম যিনি কল্যাণ ও মানবিক পরিপূর্ণতার সকল গুণে গুণান্বিত। এর অর্থ হল তার মধ্যে কোন কল্যাণের ঘাটতি ছিল না। এটাই হল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থ। **দ্বিতীয়তঃ** এতে আনুগত্য ও তাওহীদপন্থীদের বরণ করা সাব্যস্ত ﴿قَانِتًا لِّلَّهِ﴾ এতে মুশরিকদের পথ এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া প্রমাণিত হয়। সেই পথ হল শিরক, বিদ'আত ও অবাধ্যতার পথ।* এই তিনটি হচ্ছে মুশরিকদের চরিত্র। তারা আনুগত্য করে না, তাওবা করে না।

২। ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তারা কোন অবস্থাতেই বড় ছোট ও গুপ্ত শিরকে লিপ্ত হয় না এবং মুশরিকদের থেকে দূরে থাকে। শায়খ (রাহেমাহুল্লাহ) এই সমস্ত অর্থ আয়াত থেকেই উত্থাপিত করেছেন। আয়াতের অর্থ হল যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা এসব বর্জন করে। আর আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾

হুসাইন বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ বিন জুবায়েরের নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে গতরাতে তারকা ছিটকে পড়তে দেখেছে? আমি বললাম আমি দেখেছি, তারপর বললাম, আমি তো নামাযে ছিলাম না কিন্তু আমি দংশিত হয়েছি। তিনি বললেন, আপনি কি করলেন? আমি বললাম, ঝাড়ফুক করলাম। তিনি বললেন, কিসে আপনাকে ওটি করতে উদ্বুদ্ধ করল? আমি বললাম, শাবী বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বললেন, হাদীসটি কি? আমি বললাম বুরায়দা বিন হুসাইব হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, চোখ লাগা অথবা জর ছাড়া আর কোন কিছুতে ঝাড়ফুক নেই। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এটি শেষ পর্যন্ত শুনেছে সে ভাল করেছে কিন্তু ইবনে আব্বাস মহানবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

«عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذَا مُوسٰى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلاَ عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولٰئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا

শিরকের অস্বীকৃতি বুঝায়; কেননা নিয়ম হলো فعل مضارع এর উপর যদি حرف نفى আসে তবে তাতে উক্ত فعل -ক্রিয়ার মাসদারের عام نفــى এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ তিনি যেন বলেনঃ না তারা মহা শিরক করে, না ছোট শিরক, না গুপ্ত শিরক অর্থাৎ তারা কোন প্রকার শিরক করেনা। আর যে শিরক করেনা সেই হল তাওহীদপন্থী। আর সে ব্যক্তি এই জন্যই শিরক করেনা, কেননা সে তাওহীদপন্থী।

উলামায়ে কেরাম বলেনঃ আল্লাহর বাণীতে بربهم কে পূর্বে আনার কারণ হলঃ তাওহীদে রুবুবিয়াত ও তাওহীদে উলুহিয়্যাত পরস্পর জড়িত। আর এটি ঐ লোকদেরই বৈশিষ্ট্য যাঁরা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করে। কেননা শিরক না করাতে এও জরুরী হয়ে পড়ে যে সে তার প্রবৃত্তির সাথেও শিরক করবেনা, যখন কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির সাথে শিরক করে তখন সে বিদআতে পতিত হয় বা পাপে লিপ্ত হয়। সুতরাং শিরক পরিত্যাগের ফলে সমস্ত প্রকার শিরক, বিদআত ও পাপ পরিত্যাগ হয়ে থাকে। আর একেই বলা হয় আল্লাহ্ তায়ালার জন্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।

فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(صحيح البخاري، الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ح:٥٧٠٥، ٥٧٥٢ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة، ح:٢٢٠، واللفظ له)

“আমার নিকট বিভিন্ন জাতিকে উপস্থিত করা হয়েছে। আমি তাদের নবী ও তার সাথে একদল লোককে দেখলাম, আবার কোন নবী ও তার সাথে একজন ও দু’জন লোক দেখলাম, আবার কোন নবীকে শুধু একাকী দেখলাম। আমার নিকট বিরাট দলকে হাজির করা হল। আমি ভাবলাম, ওরা আমার উম্মত। আমাকে বলা হল, এটি মূসা ও তার উম্মত। আবার দেখতে পেলাম, এক বিরাট বাহিনী। আমাকে বলা হল, এটি আপনার উম্মত। তাদের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক কোন প্রকারের হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উঠে নিজ বাড়িতে ঢুকলেন। লোকে এই শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে ভাবতে লাগল। কেউ কেউ বলল, তারা হয়তো ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের (ﷺ) সহচর্য লাভ করেছে। আবার কেউ বলল, তারা হয়তো এমন লোক যারা মুসলমান বলে জন্ম লাভ করেছে এরপর আল্লাহ্‌র সাথে কোন অংশীদার স্থির করেনি এমনিভাবে তারা আরো কিছু উল্লেখ করল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তাদের কাছে এলে তারা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করল। তিনি বললেন, এরা ঐ সকল যারা ঝাড়ফুঁক করে না, শরীরে সেক দিয়ে দাগ দেয় না, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে না বরং তাদের প্রভুর উপর নির্ভর করে। তখন উক্কাশা বিন মিহসান উঠে বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট দু‘আ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহ্‌র নিকট দু‘আ করুন তিনি

যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, উক্কাশা তোমার আগেই একথা বলে ফেলেছে।[৩]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। তাওহীদের ক্ষেত্রে মানুষের স্তর জানা।

২। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থ কি তা জানা।

৩। ইবরাহীম (عليه السلام) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বলে আল্লাহ কর্তৃক তার প্রশংসা।

৪। শিরক থেকে মুক্ত থাকার কারণে ওলামাগণের প্রশংসা।

৫। ঝাড়ফুঁক ও চর্ম দগ্ধ বর্জন করা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত।

৬। এ সকল আচরণের সমন্বয়ক হচ্ছে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতা।

৭। সাহাবীদের জ্ঞানের গভীরতা যে, তারা আমল ছাড়া এটি অর্জন করতে পারবেন না।

৮। কল্যাণের প্রতি তাদের আগ্রহ।

৯। সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক থেকে এই উম্মতের সার্বিক ফযীলত বা মর্যাদা।

১০। মূসা (عليه السلام) এর অনুসারীদের মর্যাদা।

৩। হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে তারা মোটেও কোন চিকিৎসা গ্রহণ করে না। কারণ, মহানবীকে ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে, তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং একজন সাহাবীকে শরীরে দাগ দেয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে এ ধারণা করা যায় না যে তাঁরা চিকিৎসা ও ঔষধকে আরোগ্য লাভের একেবারে কারণ হিসেবে গ্রহণ করেননি।। হাদীসে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে এগুলোর ফলে আল্লাহ্র উপর ভরসা কমে যায় এবং তাতে হৃদয়ের সম্পর্ক ও আকর্ষণ ঝাড়ফুঁককারী, সেকদাতা ও গণকের দিকে ধাবিত হয়। যাতে আল্লাহ্র প্রতি ভরসায় কমতি হয়। পক্ষান্তরে, চিকিৎসা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব। কোন কোন অবস্থায় মুবাহ। মহানবী (ﷺ) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্র বান্দারা চিকিৎসা কর; হারামের মাধ্যমে চিকিৎসা করো না।"

১১। মহানবীর সম্মুখে বিভিন্ন জাতির উপস্থিতি। তাঁর প্রতি দরূদ ও ছালাম নাযিল হউক।

১২। প্রত্যেক জাতিকে পৃথকভাবে তাদের নবীর সাথে (হাশরের মাঠে) একত্র করা হবে।

১৩। নবীদের ডাকে সাড়া দানকারীদের সংখ্যা কম।

১৪। যে নবীর ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি তিনি একাকী উপস্থিত হবেন।

১৫। এই ইলমের ফল—আধিক্য দেখে ধোকা না খাওয়া। আবার সংখ্যা সল্পতার কারণে অবহেলা না করা।

১৬। চোখ লাগা ও জ্বরে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি।

১৭। সালফে সালেহীনের জ্ঞানের গভীরতা। (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) যে ব্যক্তি এটি শেষ পর্যন্ত শুনেছে সে ভাল করেছে" এ কথার প্রমাণ বহন করে। তাই প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী নয়।

১৮। সালফে সালেহীন যে বিষয় মানুষের মধ্যে নেই সে বিষয়ে প্রশংসা করা থেকে দূরে থাকতেন।

১৯। "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত" এটি মহানবীর একটি মুজিযা।

২০। উক্কাশা-এর ফযীলত বা মর্যাদা।

২১। আকার ইঙ্গিত ও চাতুর্যের প্রয়োগ।

২২। মহানবীর (ﷺ) অনুপম চরিত্র।

অধ্যায়-৩
শিরককে ভয় করা*

আল্লাহ্‌র বাণী—

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার করার পাপ ক্ষমা করেন না তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"[১] (সূরা নিসাঃ ৪৮)

ইব্‌রাহীম খলিল (ﷺ) বলেছিলেনঃ

﴿ وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾

অর্থঃ "আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ।"[২] (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৫)

---

* তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারীগণ তাওহীদের পথে চলার সাথে সাথে শিরককে ভয় করেন। যে ব্যক্তি শিরককে ভয় করে সে শিরকের অর্থ ও তার প্রকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে যাতে এগুলোয় পতিত না হয়।

১। ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ ﴾ কতিপয় বিদ্যান বলেন, এখানে ছোট, বড় ও গোপন সকল শিরক উদ্দেশ্য। শিরক এতই ভয়াবহ যে, তাওবা ছাড়া আল্লাহ্ এগুলো ক্ষমা করেন না। কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা দিয়েছেন দান ও অনুগ্রহ করেছেন। অতএব কিভাবে মন অন্য দিকে ধাবিত হতে পারে? এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও অধিকাংশ বিদ্যান। অতএব যখন কোন শিরকই ক্ষমা করা হবে না সুতরাং তা থেকে ভয় করা অপরিহার্য। আর শিরক হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আর যেহেতু রিয়া- লৌকিকতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ, তাবীজ-কবজ ঝুলান, বালা অথবা সুতা পরা অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের কোন অংশ অন্যের প্রতি সম্পর্কিত করা ইত্যাদি। যখন শিরক, আর তা ক্ষমা করা হবে না। সুতরাং তা থেকে এবং মহা শিরক থেকেও সবচেয়ে বড় ভয় করা অপরিহার্য। শিরক যেহেতু মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে অতএব, মানুষের উচিত শিরকের যাবতীয় প্রকার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা, যেন তাতে পতিত না হয়। অতপর শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) ঐ আয়াত বর্ণনা করেন যাতে ইবরাহীম (ﷺ) এর দোয়া রয়েছেঃ

﴿ وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾

২। এটি হচ্ছে মর্দে কামালের অবস্থা। তারা শুধু তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন না বরং শিরক ও তার মাধ্যমকেও ভয় করেন। أصنام শব্দটি صنم এর বহু বচন। আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত-

হাদীসে আছেঃ

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ»(مسند أحمد: ٤٢٨/٥، ٤٢٩ ومجمع الزوائد: ١٠٢/١ والمعجم الكبير للطبراني، ح: ٤٣٠١ بزيادة إِنَّ في أوله)

"আমি তোমাদের জন্য ছোট শিরকের আশংকা সবচেয়ে বেশি করি।" তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে রিয়া বা প্রদর্শন ইচ্ছা।[৩] (আহমদ, তাবরানী)

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِـدًّا دَخَلَ النَّارَ»(صحيح البخاري، التفسير، باب قوله تعالى ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا﴾ ح: ٤٤٩٧)

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন অংশীদারকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৪] (বুখারী)

পূজা করা হয় তার ছবি ও প্রতিকৃতিকে صنم বলে। তাই সেটি মানুষের চেহারার আকারে হোক প্রাণীর শরীর মাথা ইত্যাদির আকারে হোক, চাঁদ, সূর্য, কবর অথবা অন্য যে কোন আকারেই হোক। الــوثن ঃ "অসান" হল, আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়, চাই তা ছবির আকৃতিতে হোক যা আসনামের-মূর্তির অন্তর্ভুক্ত, অথবা ছবির আকৃতির না হোক যেমনঃ কবর, মাজার।

৩। রিয়া সম্পর্কে মানুষ অসচেতন এবং আল্লাহ্ এটি ক্ষমা করেন না তাই মহানবী এ বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। রিয়া দুই প্রকারঃ (ক) মুনাফিকদের রিয়া। অর্থাৎ মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে থাকে কুফরী ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ অর্থাৎ "তারা লোকদেরকে দেখায় আর তারা অতি অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে।" (খ) তাওহীদপন্থী মুসলমানের রিয়া। যেমনঃ খুব সুন্দর করে নামায পড়ে যাতে মানুষ তা দেখে প্রশংসা করে। এটি ছোট শিরক।

৪। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ডাকা বড় শিরক। সহীহ হাদীসে আছে, "ডাকটাই ইবাদত"। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য ইবাদতের কিছু অংশ সাব্যস্থ করল সে নিজের জন্য জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নিলো। নবীর বাণীঃ دخل النــار অর্থাৎ যেমন কাফেরদের অবস্থান জাহান্নামে চিরস্থায়ী অনুরূপ তার অবস্থাও। কেননা মুসলমান যদি মহা শিরকে পতিত হয় তবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে, যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾

«مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركًا دخل النار، ح:٩٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৫]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। শিরকের ভয়।

২। রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছু শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৩। এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪। নেক্‌কারদের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে বড় আশংকা।

৫। জান্নাত ও জাহান্নামের নৈকট্য।

অর্থঃ "আর তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে নিশ্চয়ই তোমার কৃতকর্ম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা যুমারঃ ৬৫)

হাদীসে বর্ণিত শব্দ من دون الله-এর তাফসীরকারক ও দ্বীনি গবেষকদের মতে তাফসীর হলঃ যে আল্লাহকে ডাকে ও আল্লাহর সাথে অন্যকে ডাকে এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার দিকেই মুক্ত হয়ে ধাবিত হয়।

৫। হাদীসের অর্থ হলঃ যে ব্যক্তি কোন ধরনের শিরক করল না এবং (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) কারো মুখাপেক্ষী হল না, না কোন ফেরেশ্‌তা আর না কোন নবী, না কোন অলী ও না কোন জ্বিনের সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাকে তাঁর রহমতে ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এখানে মহা শিরক, ছোট শিরক ও গোপন শিরক সবই অন্তর্ভুক্ত। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কি সাময়িকভাবে না স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে? (ক) বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। সেখান থেকে বের হবে না। (খ) আর ছোট ও গোপন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নামে থাকার পর বের হয়ে আসবে ; কারণ সে তাওহীদবাদী।

৬। একই হাদীসে উভয়টির (জান্নাত ও জাহান্নাম) নৈকট্য সম্পর্কে আলোচনা।

৭। যে ব্যক্তি শিরক না করে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি শিরক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে যত বড় আবেদই হোক না কেন।

৮। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইবরাহীম (عليه السلام) নিজের জন্য ও বংশধরদের জন্য মূর্তিপূজা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দু'আ করেন।

৯। অধিকাংশ লোকের অবস্থা এরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾

১০। এতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর তাফসীর রয়েছে।

১১। শিরক থেকে মুক্ত ব্যক্তির ফযীলত।

অধ্যায়-৪
"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্য বাণীর প্রতি আহ্বান*

আল্লাহ্র বাণী—

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾

অর্থঃ "বলুন, এটি আমার পথ। আমি জেনে বুঝে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি।"[১] (সূরা ইউসুফঃ ১০৮)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) মুয়াযকে ইয়ামানে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেনঃ

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلٰى أَنْ يُّوَحِّدُوا اللهَ ـ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى

---

* মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে, শিরকভীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তাওহীদ ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। এটিই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকৃত স্বরূপ। কেননা এর অর্থ হলঃ তার আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তার দাবী সম্পর্কে অন্যকে জানান। তাওহীদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হল তার সঠিক দিক ও প্রকারের প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং শিরক ও শিরকের প্রকারসমূহ থেকে নিষেধ করা। আর এটিই হল সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১। একমাত্র আল্লাহর দিকে অন্য কারো দিকে নয়। আল্লাহ্র এই বাণীতে দুটি উপকারিতা রয়েছেঃ (ক) তাওহীদের প্রতি আহ্বান। (খ) খুলুসিয়াত সম্পর্কে সচেতনতা। কেননা, যদিও অনেকে হকের পথে আহ্বান করে কিন্তু বাস্তবে সে নিজের দিকেই আহ্বান করে থাকে। على بصيرة অর্থাৎ তাওহীদের দিকে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস, জ্ঞান ও বুঝের মাধ্যমে আহ্বান করেন বরং আল্লাহর পথে না জেনে না বুঝে দাওয়াত দেন না। أنا ومن اتبعني এর অর্থ হল আমি আল্লাহর পথে জেনে বুঝে আহ্বান করি এবং আমার যারা অনুসারী ও যারা আমার দাওয়াত কবুল করেছে তারাও সে পথে জেনে বুঝে দাওয়াত দেয়। সুতরাং নবীগণের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা শুধু শিরককে ভয় এবং তাওহীদকে বাস্তবায়ন করেই ক্ষান্ত হন না বরং তাওহীদের প্রতি আহ্বানও করেন।

فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» (صحيح البخاري، الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ح:١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧٢ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ح:١٩)

“নিশ্চয় তুমি এক গ্রন্থধারী জাতির নিকট যাচ্ছ, কাজেই তুমি সর্বপ্রথম তাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দিবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র তাওহীদের দাওয়াত দিবে। তারা যদি তোমার কথা মানে তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ পাক তাদের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়েছেন। তারা যদি তোমার কথা মানে তাহলে তাদের জানিয়ে দাও আল্লাহ্ তাদের জন্যে যাকাত ফরয করেছেন, তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি তোমার কথা মানে তাহলে তাদের দামী সম্পদগুলো (জোরপূর্বক) গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থাক। অত্যাচারি ব্যক্তির বদ্‌দু‘আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ সেটির মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোনই পর্দা নেই।[২] (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমে সাহল বিন সা’দ (ﷺ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) খায়বারের দিন বলেনঃ

«لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ

২। হাদীসটি থেকে দলীল গ্রহণের কারণ হলঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াযকে যখন দাওয়াতের জন্য পাঠান নির্দেশ দেন যে, তাঁর দাওয়াত যেন সর্বপ্রথম “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্যর প্রতি হয়। এর ব্যাখ্যা রয়েছে অন্য বর্ণনায় যা ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এনেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে।

يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ»(صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ح:٣٧٠١ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ح:٢٤٠٦)

“আমি অবশ্যই আগামীকাল পতাকাটি এমন এক ব্যক্তিকে দিব, যে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ্ তার হাতে বিজয় দান করবেন। লোকেরা রাতভর জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল এটি কাকে দেয়া হয়। সকালে সবাই আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট গেলো। প্রত্যেকেরই আশা এটি তাকে দেয়া হবে। তিনি বললেন, আলী বিন আবু তালিব কোথায়? বলা হল, তিনি তার চোখের সমস্যায় ভুগছেন। তাকে লোকেরা গিয়ে নিয়ে এল। তিনি তার দুই চোখে থুথু দিলেন। তার জন্য দু‘আ করলেন। তিনি এমন আরোগ্য লাভ করলেন যে, তার যেন কোন ব্যাথাই ছিল না। তিনি তাকে পতাকা দিলেন এবং বললেন, তুমি দৃঢ়তার সাথে চল। তাদের জনপদে উপনীত হয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দাও। জানিয়ে দাও তাদের উপর আল্লাহ্‌র কি কি ওয়াজিব হক রয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক এক ব্যক্তির হেদায়েত তোমার জন্য লাল উটের চেয়ে বেশি উত্তম।”[৩]

৩। হাদীসে বর্ণিত ثم ادعهم إلى الإسلام (তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও) এর উদ্দেশ্য হলঃ ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে তাওহীদের দাওয়াত। কারণ, ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হল এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন যে,

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া রাসূলের অনুসারীর পথ।

২। খুলুসিয়াত সম্পর্কে সচেতনতা। কারণ, অনেক মানুষ হকের দাওয়াত দিলে নিজের দিকেই দাওয়াত দেয়।

৩। জেনে বুঝে দাওয়াত দেয়া ফরয।

৪। উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ সব ধরনের দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত বিশ্বাস করা।

৫। আল্লাহর জন্য গাল-মন্দের কারণ হওয়া জঘন্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৬। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে মুসলমানকে মুশরিকদের থেকে দূরে রাখা যাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়। যদিও সে শিরক না করে।

৭। প্রথম ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ।

৮। সবকিছুর আগে এমনকি নামাযেরও আগে তাওহীদ দিয়ে দাওয়াত শুরু করতে হবে।

৯। "তারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে" এবং "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" উভয়ের একই অর্থ।

১০। কতিপয় আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদের যথাযথ জ্ঞান রাখে না অথবা জ্ঞান রাখে কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করে না।

১১। ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতা।

তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে তাদের উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে তা জানিয়ে দেয়া। চায় সে অধিকার তাওহীদ সম্পর্কিত হোক বা ফরয ও ওয়াজিব সম্পর্কিত বা হারাম থেকে সতর্ক থাকা সম্পর্কিত। এজন্য যখন কোন ব্যক্তি কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে সে যেন প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেয় এবং "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করে দেয়। তারপর তাকে হারাম এবং ফরয ও ওয়াজিব সম্পর্কেও অভিহিত করে, কেননা মৌলিক বিষয়ই প্রথম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও অপরিহার্য হয়ে থাকে।

১২। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে তারপর কম গুরুত্বপূর্ণটি শুরু করতে হবে।

১৩। যাকাতের খাত।

১৪। শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর সন্দেহ দূর করা।

১৫। যাকাত সংগ্রহের সময় মূল্যবান সম্পদ জোরপূর্বক গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা।

১৬। অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকা।

১৭। অত্যাচারীত ব্যক্তির বদদু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

১৮। তাওহীদের একটি বড় প্রমাণ হলো নবীকুল শিরমণি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণের জীবনে দুর্দশা, ক্ষুধা ও বিপদাপদের প্রাদুর্ভাব।

১৯। নবীর বাণীঃ "অবশ্যই আমি পতাকা দিব..." এটি হলো একটি নবুওয়াতের আলামত।

২০। চোখে থুতু দেয়া এটিও একটি নবুওয়াতের চিহ্ন।

২১। হযরত আলীর ফযীলত।

২২। অন্য সাহাবীগণের ফযীলত যারা বিজয়ের সংবাদ থেকে বিমূখ হয়ে (নবীর মুহাব্বাত ও পতাকা পাওয়ার আকাঙ্খায়) ঐ রাত জল্পনা-কল্পনা করে কাটিয়ে দেন।

২৩। ভাগ্যের উপর ঈমান আনা। আর তা হলো বিনা প্রচেষ্টায় একজনের ঝান্ডা লাভ করা এবং অন্যদের চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া।

২৪। মহানবীর আলীর প্রতি নির্দেশঃ "দৃঢ়তার সাথে সোজা চলবে" এটি তার যুদ্ধ কৌশল।

২৫। যুদ্ধের ঘোষণার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া।

২৬। যুদ্ধের পূর্বে যাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাদের সাথে যুদ্ধ করা শরীয়ত সম্মত।

২৭। মহানবীর বাণী অনুযায়ী প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দেয়া।

২৮। ইসলামে আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান।

২৯। যার হাতে এক ব্যক্তি হেদায়েত পেয়েছে তার সওয়াব।

৩০। ফতোয়া বিষয়ে কসম খাওয়া।

অধ্যায়-৫
তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সাক্ষ্য বাণীর ব্যাখ্যা*

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾

অর্থঃ "যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য অবলম্বন তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল।"[১] (বনী ইসলাইলঃ ৫৭)

---

* সাক্ষ্যবাণীতে কয়েকটি বিষয় রয়েছেঃ (১) সাক্ষ্যবাণী মুখে উচ্চারণ করা। (২) যা উচ্চারণ করেছে এবং যেটির সাক্ষ্য দিয়েছে তা বিশ্বাস করা। এতে থাকতে হবে জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস। (৩) খবর দেয়া বা সাক্ষ্যবাণী সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করা। সাক্ষ্য বাণী মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। আর সাক্ষ্য দেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুখে উচ্চারণ করে অন্যকে অবহিত না করে। সুতরাং أشهد (আমি সাক্ষ্য দেয়) এর অর্থ দাঁড়াবেঃ "আমি বিশ্বাস রাখি", আমি মৌখিক স্বীকৃতি দেয় (মুখে বলি) এবং অন্যকেও অবহিত করি। আর তিন অর্থই এর মধ্যে এক সাথে হওয়া জরুরী। لا إله إلا الله এর لا হলো نفي جنس এর যার ফলে এর অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুই ইবাদতের উপযুক্ত নয়। نفي এর পর إلا (হরফে ইস্তিসনা) حصر -এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র আল্লাহই তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই।

إله শব্দটির অর্থ হলো মা'বূদ। লায়ে নাফী জিনসের উহ্য খবর موجود নয়, কেননা আল্লাহর সাথে যে সব উপাসকের ইবাদত করা হয় তারাও মওজুদ। সুতরাং এক্ষেত্রে উহ্য খবর হলো بحق বা حق অতএব বাক্যটির অর্থ হবে لا إله بحق অর্থাৎ প্রকৃত কোন মা'বূদ-উপাস্য নেই। কেননা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যা কিছুরই ইবাদত করা হয় তারাও তো মা'বূদ-উপাস্য যদিও তাদের ইবাদত করা ভ্রান্ত, বাতিল, যুলুম ও সীমালংঘন। আর একজন আরবী ভাষী لا إله إلا الله শুনে এ অর্থই বুঝবে।

১। এই আয়াতে يدعون এর অর্থ হলো يعبدون "ওয়াসীলাহ" অর্থ ইচ্ছা ও প্রয়োজন। অর্থাৎ তারা নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্‌মুখী হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালাই এর জন্য নির্ধারিত, অতএব তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যমুখী হয় না বরং তাদের প্রবণতা আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ إلى ربهم বলে রুবুবিয়াতের বর্ণনা দেন, কেননা দোয়া কবুল ও

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ○ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى ﴾

অর্থঃ "যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[২] (সূরা যুখরুফঃ ২৬)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থঃ "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত।"[৩] (সূরা তাওবাহঃ ৩১)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾

অর্থঃ "কতিপয় লোক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করে। তারা তাদের আল্লাহ্‌কে ভালবাসার মতোই ভালবাসে।"[৪] (সূরা বাকারাঃ ২৬৫)

সওয়াব দেয়াই হল রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট। সুতরাং এ আয়াতে তাওহীদের তাফসীর প্রস্ফুটিত হয়েছে, আর তা হলো, সব ধরনের প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহরই নিকট পুরা হতে পারে।

ويرجون رحمته ويخافون عذابه

অর্থাৎ "তারা তাঁর রহমতের আশাধারী এবং তাঁর আযাব থেকে ভয়কারী" আর এ হলো আল্লাহর বান্দাদের বিশেষ অবস্থা যে তারা ইবাদতের মধ্যে মুহাব্বত, ভয় ও আকাঙ্খাকে একত্রিত করে, আর এটিই তো হলো তাওহীদের তাফসীর।

২। এ আয়াতে রয়েছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক। এ দু'টি না হলে তাওহীদের মর্ম পূর্ণ হবে না। এটি ব্যতীত কারো ইসলামও সঠিক হবে না।

৩। "রুবূবিয়্যাহ" অর্থঃ ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকেও মেনে চলে। অথচ অনুসরণ ও মেনে চলা তাওহীদেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশুদ্ধ হাদীসে আছে, মহানবী (ﷺ) বলেছেনঃ

«مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . ، ح:٢٣)

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে।[৫] তার সম্পদ ও রক্ত নেয়া হারাম হয়ে যাবে।"[৬] তার হিসাব আল্লাহ্র উপর।"

এ অনুবাদের ব্যাখ্যা হল পরের কয়েকটি অধ্যায়।[৭]

৪। আয়াতের তাৎপর্য হল, তারা ঐ সকল প্রভূর ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসার সাথে একীভূত করে ফেলেছে। ভালোবাসায় একীভূত করে ফেলা- এটিই হচ্ছে শিরক। আর এটিই তাদেরকে জাহান্নামী করেছে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের সংবাদ দিয়ে সূরা শূরা ৯৭ ও ৯৮ নং আয়াতে বলেনঃ ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝ إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে জগত সমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করতাম। ভালোবাসাও এক প্রকার ইবাদত। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসাকে একক সাব্যস্ত না করল সে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নিল আর এটিই হলো তাওহীদ ও لا إله إلا الله এর অর্থ।

৫। শুধু "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র স্বীকৃতি দিলেই যথেষ্ট হবে না বরং আল্লাহ্ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করবে সেই মুসলমান। তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের প্রাণ সম্পদ গ্রহণ করা হালাল হবে না।

৭। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি তাওহীদের ব্যাখ্যা। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর ব্যাখ্যা। তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়ের বিবরণ। ছোট বড় ও গুপ্ত শিরকের বিবরণ এক কথায় তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কিত সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

এটি তাওহীদের এবং সাক্ষ্য বাণীর ব্যাখ্যা। উভয়ের মাঝে কয়েকটি স্পষ্ট বিষয় রয়েছে। সূরা বানী ইসরাইলের আয়াত। এতে ঐ সকল মুশরিকের কার্যাবলীর প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা নেক্‌কারদের ডাকে। এতে বলা হয়েছে যে, এটিই বড় শিরক। এখানে রয়েছে সূরা বারা- তাওবার আয়াত, যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাব- ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাতে আরো বর্ণনা রয়েছে যে, তারা শুধু এক আল্লাহরই ইবাদতের জন্য আদিষ্ট। আলেম ও দরবেশদের পাপের কাজে আনুগত্য নাই ও না তাদের নিকট দোয়া করা যাবে। উক্ত আয়াতের এ তাফসীরেও কোন দ্বন্দ্ব নেই। ইব্‌রাহীম (عليه السلام) এর বৈরিতা ও মিত্রতা- এটিই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

অর্থঃ "সে (ইবরাহীম) তার পিছনে সেই চিরন্তন কালেমাকে রেখে গেছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে।" (সূরা যুখরুফঃ ২৮)

আরো রয়েছে সূরা বাকারার আয়াত, যাতে কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ﴾

অর্থঃ "তারা কখনও জাহান্নাম হতে বের হতে পারবে না।" (সূরা বাকারাঃ ১৬৭)

তাতে আল্লাহ একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের শরীকদের সেইরূপ ভালোবাসে, যেমনঃ আল্লাহকে ভালোবাসে। তা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহকে অত্যন্ত ভালবেসে থাকে, যদিও তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। অতএব, যারা আল্লাহ অপেক্ষা শরীকদেরকে অধিকতর ভালবাসে, তাদের অবস্থা কি হবে? আর তাদের অবস্থায়ই বা কি হবে যারা শুধুমাত্র শরীকদেরকেই ভালবাসে আর আল্লাহকে মোটেই ভালবাসে না।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে আর আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়, তাকে অস্বীকার করে ; তার সম্পদ ও রক্ত হারাম, আর তার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র যে তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কারণ তা শুধু মুখে উচ্চারণ করাকেই জানও মালের নিরাপত্তা বলে স্থির করা হয়নি, মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে তার শাব্দিক অর্থ জানাকেও নয়, শুধু তার স্বীকৃতি দেয়াকেও নয়, এমনকি একক এবং লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেও জান ও মালেল নিরাপত্তা বিধান নেই। যতক্ষণ না তার সাথে সমস্ত মিথ্যা মা'বূদগুলিকে অস্বীকার করবে। এমন কি তার মনে ঐ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ইতস্ততঃ করার ভাব যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ তার জান ও মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই।

তাই তো দেখা যায় তাওহীদের বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার মর্যাদা কত উর্দ্ধে। আরো লক্ষণীয় যে, কত বিশদ ও স্পষ্টভাবে তা বর্ণিত হয়েছে এবং তার দলীল প্রমাণগুলি কত যুক্তিযুক্ত। যা তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রেও কেমন অকাট্য ও অখণ্ডনীয়।

অধ্যায়-৬
বালা-মুসীবতের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য বালা সূতা প্রভৃতি ব্যবহার করা শিরক*

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَـٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾

---

* এ অধ্যায়ে তাওহীদের বর্ণনা শুরু হচ্ছে তার পরিপন্থী শিরকের বর্ণনার মাধ্যমে। সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু সম্পর্কে জানার দু'টি দিক রয়েছেঃ তার বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও তার বিপরীত বিষয়কে জানা। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব এখানে তাওহীদের বিপরীত বিষয় অর্থাৎ শিরকে আকবারের বর্ণনা শুরু করেন। আর তাওহীদের পরিপন্থী যা অর্থাৎ মহা শিরক- শিরকে আকবার তাওহীদকে স্বমূলে বিনাশ করে দেয় এবং যে এ মহা শিরকে পতিত হয় সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আর দ্বিতীয়তঃ কতিপয় শিরক এমন রয়েছে যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী। কেননা পরিপূর্ণ তাওহীদ হলো, সব ধরনের শিরক থেকে মুক্ত থাকা।

শায়খ- রাহেমাহুল্লাহ শিরকের বিশদ বর্ণনা কতিপয় এমন ছোট শিরকের মাধ্যমে শুরু করেন যাতে মানুষ সাধারণত বেশি বেশি পতিত হয় এবং তিনি নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে ধাবিত হওয়ার ভিত্তিতে ছোট শিরক মহা শিরকের পূর্বে বর্ণনা করেন।

বিশেষ আকীদা বিশ্বাস নিয়ে যা কিছুই ঝুলানো হবে অথবা পরা হবে সেটিই এর (বালা সূতা প্রভৃতি) অন্তর্ভুক্ত হবে চাই সেটি বাড়িতে ব্যবহার করা হোক অথবা গাড়িতে অথবা ছোটদের শরীরে লাগানো হোক এসব কিছু শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আরবদের বিশ্বাস ছিল এগুলিতে উপকার হয়। হয়তো বা বালা-মুসীবতে পতিত হওয়ার পর তা দূর করার ক্ষেত্রে বা তাতে পতিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে। আর এ বিশ্বাস হলো মারাত্মক। কেননা এতে বিশ্বাস করা হয় যে, এ নগণ্য বস্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত তাকদীরকেও প্রতিহত করে, এ ধরনের বিশ্বাস ছোট শিরক কিভাবে হতে পারে? (বরং তা বড় শিরক) কেননা এ বিশ্বাসীর অন্তর সেগুলির সাথে সম্পৃক্ত এবং সেগুলিকে বিপদ-আপদ উদ্ধার ও তা প্রতিহত করার কারণ বলে মনে করে।

এ ক্ষেত্রে এর সূত্র হলঃ শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত ক্রিয়াকারী কোন কারণই সাব্যস্থ করা জায়েয নয়। অথবা এমন কোন বাস্তব প্রয়োগ কৃত স্পষ্ট কারণ হতে হবে যার মধ্যে কোনরূপ অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা নেই। যেমন ডাক্তারী ঔষধ এবং এমন কোন মাধ্যম যার উপকার বা ক্রিয়া প্রকাশ্য যেমনঃ আগুন দ্বারা তাপ গ্রহণ, পানির দ্বারা ঠাণ্ডা বা অনুরূপ কিছু। এসব মাধ্যম প্রকাশ্য যার প্রভাবই স্পষ্ট। কখনো কখনো ব্যক্তির নিয়তের ভিত্তিতে সব ধরনেরই ছোট শিরক মহা শিরকে পরিণত হতে পারে। যেমনঃ বালা ও সূতা পরার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি সেটিকে মাধ্যম মনে না করে সরাসরি তাকেই ক্রিয়াকারী বিশ্বাস করে। অতএব এ অধ্যায় অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

অর্থঃ "বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক[১] তারা কি সে অনষ্টি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে?"[২] (সূরা যুমারঃ ৩৮)

ইমরান বিন হুসাইন (ﷺ) থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِّنْ صُفْرٍ فقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: انْـزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، فَإِنَّـكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»(مسند أحمد: ٤/ ٤٤٥ وسنن ابن ماجه، الطب، باب تعليق التمائم، ح: ٣٥٣١)

১। অর্থাৎ তোমরা স্বীকার করছ যে, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ্ এরপর আবার অন্য কিছুর ইবাদতে লিপ্ত হচ্ছো? কুরআন মাজীদের এরূপই নীতি যে, মুশরিকরা যে তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ স্বীকৃতি দেয় কুরআন তাদের ঐ স্বীকৃতিকেই তাদের বিরুদ্ধে পেশ করে ইবাদতের তাওহীদকে সাব্যস্ত করে। যে তাওহীদকে তারা অস্বীকার করে থাকে। تـدعون শব্দটিতে দোয়া দুই অর্থে ব্যবহৃতঃ প্রার্থনা মূলক ও ইবাদত মূলক। আর মুশরিকদের দোয়াতে এ দু'প্রকারই বিদ্যমান। আল্লাহ ব্যতীত যাকে ডাকা হয় তারা বিভিন্ন ধরনেরঃ তাদের মধ্যে কেউ নবী, রাসূল ও সৎ লোকদেরকে আহ্বান করে, কেউ বা আল্লাহর ফেরেশ্তাকে, আবার কেউ তারকা মন্ডলীর দিকে ধাবিত হয়, কেউ বা গাছ বা পাথরের প্রতি এবং অন্যরা মূর্তির প্রতি ধাবিত হয়।

২। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উক্ত সব ধরনের বাতিল মা'বূদদের ক্ষতি ও উপকার সাধনের ক্ষমতাকে বাতিল সাব্যস্ত করেন। অতএব উক্ত ভ্রান্ত মা'বূদগুলি সম্পর্কে মুশরিকগণের বিশ্বাস যে আল্লাহর নিকট তাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, যার ফলে তারা তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে, তা বাতিল ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয়।

সালফে সালেহীন ছোট শিরকের বিলোপ সাধনের জন্য বড় শিরকের ক্ষেত্রে বর্ণিত আয়াত পেশ করেন। কারণ উভয় শিরকই হচ্ছে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। বড়টির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই যখন বাতিল বলে গণ্য হয়েছে তখন ছোটটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? উক্ত আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো এ ক্ষমতা নেই যে, সে কারো কোন ক্ষতি করতে পারবে বা কোন উপকার সাধন করতে পারবে। অনুরূপ আল্লাহ কারো ক্ষতি করলে তার বিনা হুকুমে তা থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে উপকার করার ও ক্ষতি করার উপযুক্ত মনে করার এটিই অর্থ। যার কারণেই মুশরিকগণ বালা ও সূতা ব্যবহার করে থাকে।

"মহানবী (ﷺ) এক ব্যক্তির হাতে একটি পিতলের বালা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "এটি কি? সে বলল, কষ্টের কারণে তিনি বললেন, তুমি ওটি খুলে ফেল। কারণ, ওটি শুধু তোমার কষ্টকেই বাড়িয়ে দিবে। ওটি তোমার সাথে থাকা অবস্থায় তুমি যদি মারা যাও তাহলে কখনো পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না।" (আহমাদ, সূত্রটি মন্দ নয়।)[৩]

উকবা বিন আমির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবীয ঝুলানো সম্পর্কে বলেছেনঃ

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ»(مسند أحمد: ٤/ ١٥٤)

৩। হাদীসে বর্ণিত ماهـذا। শব্দটি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃঢ় প্রতিবাদমূলক। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীঃ الواهنـة। এক ধরনের রোগ যা শরীরকে দূর্বল করে দেয়। অতপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ সেটিকে খুলে ফেল। এ ছিল তাঁর নির্দেশ, যদি এমন ব্যক্তি হয় যে তাকে নির্দেশ দিলে সে মেনে নিবে তবে তাকে মুখ দ্বারা নির্দেশ দেয়াই যথেষ্ট, হাত দ্বারা বারণ করার প্রয়োজন নেই।

فإنك لا تزيدك إلا وهناً

"এ তোমার অসুস্থতা আরো বৃদ্ধিই করবে।" অর্থাৎ যদি তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী তার কোন প্রভাব থাকে তবে তা শুধু তোমার শরীরেই ক্ষতি সাধন করবেনা বরং তার সাথে অন্তর-আত্মারও ক্ষতি সাধন করবে যার ফলে তোমার অন্তর ও আত্মা দূর্বল ও ব্যাধিগ্রস্তই হয়ে পড়বে। এ হলো প্রত্যেক মুশরিকের অবস্থা যে, *(না বুঝার কারণে) ছোট ক্ষতি থেকে* বড় ক্ষতিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে যদিও (তার নির্বুদ্ধিতার কারণে) তা উপকার জ্ঞান করে থাকে।
তাঁর বাণীঃ

فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدًا

অর্থঃ "যদি তোমার এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে কোনক্রমেই মুক্তি-পরিত্রাণ পাবেনা।" যে পরিত্রাণকে অস্বীকার করা হয়েছে তা দুই প্রকারের হতে পারেঃ (ক) পূর্ণ পরিত্রাণ। আর তা হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। আর এ পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হবে যারা মহা শিরক করবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এ বিশ্বাস করবে যে, পিতলের বালা সূতা যা ঝুলানো হয় তা নিজে নিজেই উপকার সাধন করতে পারে। (খ) আংশিক পরিত্রাণ যখন মানুষ ছোট শিরকে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ ঐ বস্তুকে মুক্তির কারণ গ্রহণ করা আল্লাহ যা কারণ সাব্যস্ত করেননি। এ জন্যে তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

"যে ব্যক্তির তাবীয ঝুলাবে, আল্লাহ্ তার সেটি পূরণ করবেন না। আর যে ঝিনুক ঝুলাবে আল্লাহ্ তাকে স্বস্তিতে রাখবেন না।"[৪]

আরোও একটি বর্ণনায় রয়েছে–

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»(مسند أحمد: ٤/١٥٦)

"যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলাল সে শিরক করল।"

ইবনে আবী হাতীম হুযাইফা (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন,

«أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِّنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ»(ذكره ابن كثير في التفسير: ٤/ ٣٤٢)

"তিনি এক ব্যক্তি হাতে জ্বরের সূতা দেখতে পেয়ে ওটি কেটে ফেললেন এবং তেলাওয়াত করলেন।"

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾

অর্থঃ "অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু সাথে সাথে শিরক ও করে।"[5] (সূরা ইউসুফঃ ১০৬)

৪। আরবী ভাষায় 'তামীমাহ' শব্দ এসেছে। চোখ লাগা অথবা ক্ষতি হিংসা প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য যা কিছু বুকে ঝুলানো হয় তাই তামীমাহ বা তাবীয। তামীমা-তাবীজ এর নামকরণঃ এজন্য তামীমা বলা হয় যে, এর দ্বারা বিশ্বাস করা যে, তা কৃতকর্ম পূর্ণ করবে। সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও বদদোয়া করেন যেন তার দ্বারা কিছু পূর্ণ না হয়। 'ওয়াদ'আহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে এক প্রকারের ঝিনুক যা লোকেরা বুকে অথবা হাতে ঝুলায় অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য। এমন কর্ম কারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদ দোয়া করেন, যেন আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে আরাম, শান্তি ও স্থিরতায় থাকতে না দেন, কেননা সে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে।

৫। হাদীসে বর্ণিত من الحمى অর্থাৎ সে ব্যক্তি জ্বর দূর করার জন্য সুতা ঝুলিয়ে ছিল অথবা তা প্রতিহত করার জন্য। অতপর তিনি তা কেটে দেন তাঁর কেটে দেয়া প্রমাণ করে যে তা বড় অন্যায়। অতএব তা থেকে বাঁধা দেয়া ও কেটে ফেলা জরুরী।
এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু তাওহীদে রুবূবিয়্যার স্বীকৃতি দিলেই মুক্তি পাওয়া যাবে না বরং ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রেও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই আয়াতটি হলো মহা শিরকের দলীল। লেখক বলেনঃ সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) মহা শিরকের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের দ্বারা ছোট শিরকও উদ্দেশ্য করে থাকেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। বালা, সূতা প্রভৃতি পরায় কঠোরতা।

২। হাদীসে বর্ণিত সাহাবী যদি বালা ব্যবহার করা অবস্থায় মারা যেতেন তাহলে তিনি পরিত্রাণ পেতেন না। এতে প্রমাণ রয়েছে যে, ছোট শিরক কবীরা গোনাহের চেয়েও মারাত্মক।

৩। এক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করা হয় না।

৪। এতে বর্তমানেও কোন উপকারিতা নেই ; ক্ষতি আছে।

৫। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন।

৬। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এভাবে তাবীয ঝুলাবে তাকে ওটির উপর ছেড়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না।

৭। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলাবে সে শিরকে লিপ্ত হবে।

৮। জ্বরের কারণে তাবীয ঝুলালেও সেটি তাবীযেরই অন্তর্ভুক্ত।

৯। হুযায়ফা কর্তৃক আয়াতটি পাঠে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম বড় শিরকের ক্ষেত্রে বর্ণিত আয়াত দিয়ে ছোট শিরকের খন্ডন করতেন। যেমনটি আব্বাস (رضي الله عنه) সূরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

১০। চোখ লাগার কারণে ঝিনুক ঝুলানোও এর অন্তর্ভুক্ত।

১১। যারা তাবীয ও ঝিনুক ইত্যাদি ব্যবহার করতে তাদের জন্য বদ দো'আ করা হয়েছে। আল্লাহ্ যেন তার আশা পূরণ না করেন। আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।

অধ্যায়-৭
ঝাড়ফুঁক ও তাবীয সম্পর্কিত*

আবু বাশীর আনসারী (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত,

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولاً أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِّنْ وَتَرٍ -أَوْ قِلاَدَةٌ-إِلاَّ قُطِعَتْ»

(صحيح البخارى، الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ح:٣٠٠٥ وصحيح مسلم، اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ح:٢١١٥)

"তিনি কোন এক সফরে আল্লাহ্‌র রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে ছিলেন। তিনি একজন দূতকে এই কথা বলে প্রেরণ করেন যে, কোন উটের গলায় দড়ির মালা অথবা যে কোন মালা দেখলেই তা যেন কেটে ফেলা হয়।"[১]

---

* এ অধ্যায়ে ঝাড় ফুঁকের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ঝাড়ফুঁক হচ্ছে এমন সব দু'আ যা পড়ে ফুঁক দেয়া হয়। কোনটি শরীরে ক্রিয়া করে আবার কোনটি রূহে ক্রিয়া করে। কোনটি জায়েয আবার কোনটি শিরক। শিরক মুক্ত ঝাড়ফুঁক জায়েয। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "যে ঝাড়ফুঁকে শিরক নেই তাতে কোন দোষ নেই"। শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যোর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয় অথবা ফরিয়াদ করা হয়। অথবা তাতে থাকে কোন শয়তানের নাম অথবা এ বিশ্বাস রাখা হয় যে খোদ ঝাড়ফুঁকই ক্রিয়া করবে, তখন এ ধরনের ঝাড়ফুঁক নাজায়েয হবে ও তা শিরকি ঝাড়ফুঁকের অন্তর্ভুক্ত। আর তামীমা অর্থাৎ তাবীজ থেকে উদ্দেশ্য হলোঃ চামড়া, পুঁতি, লিখিত কিছু শব্দাবলী বা বিভিন্ন ধরনের বস্তু যেমনঃ ভালুকের অথবা হরিণের মাথা, ঘোড়ার ঘাড়, কাল কাপড়, চোখের আকৃতি বা তসবীর নির্ধারিত আকৃতির কিছু ঝুলানো ইত্যাদি। এসব তাবীজের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, প্রত্যেক ঐ বস্তু যার ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, এটি কল্যাণও ভাল কাজের মাধ্যম- কারণ এবং অনিষ্ঠের প্রতিরোধক তাই হলো তামীমা-তাবীজ। আর শরীয়ত এরই অনুমতি দেয়নি। কতিপয় লোক বলেঃ এগুলি এমনি এমনি ঝুলাই তাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বা বলে থাকে তা গাড়িতে বা বাড়িতে শোভা-সৌন্দয্যের জন্য ঝুলান হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জেনে রাখা উচিতঃ তাবীয যদি কোন কিছু প্রতিরোধ বা দূর করার জন্য ঝুলান হয় আর বিশ্বাস করা হয় যে তাবীয এক্ষেত্রে একটি মাধ্যম বা কারণ তবে তা নিশ্চয়ই ছোট শিরক। আর যদি তা শোভার জন্য ঝুলান হয় তবে হবে হারাম, কেননা যে এর মাধ্যমে ছোট শিরক করে তারই সাথে তার সদৃশ হয়ে যায়। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন জাতির সদৃশ ধারণ করল সে তাদেই অন্তর্ভুক্ত।"

ইবনে মাসউদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি,

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (مسند أحمد: ١/ ٣٨١ وسنن أبي داود، الطب، باب تعليق التمائم، ح: ٣٨٨٣)

"নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও পরস্পর প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কিছু তৈরি করা শিরক।"[২] আহমাদ ও আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন উকাইম থেকে মারফুভাবে বর্ণিত।

«مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»(مسند أحمد: ٤/ ٣١٠، ٣١١ وجامع الترمذي، الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، ح: ٢٠٧٢)

"যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলাবে তাকে ওটির উপর ছেড়ে দেয়া হবে।"[৩] (আহমদ ও তিরমিযী)

১। আরবদের বিশ্বাস ছিল এ ধরনের হার জীব-জন্তুকে চোখ লাগানো থেকে রক্ষা করে তাই ওটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২। হাদীসে সকল প্রকার ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও পরস্পর প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কিছু তৈরি শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে শিরকমুক্ত ঝাড়ফুঁক জায়েয। কেননা হাদীসে আছে, "শিরক না হওয়া পর্যন্ত ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নাই।" এ ছাড়া মহানবী ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁকেও ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে। অতএব দলীলে প্রমাণ করে যে প্রত্যেক প্রকার ঝাড়ফুঁক শিরক নয় বরং কতক ধরনের, আর তা হলো যেগুলি শিরকযুক্ত। অপরদিকে সকল প্রকার তাবীয তাগা ও যাদু নিষিদ্ধ। التولة শায়খ তেওয়ালার ব্যাখ্যা দেন যে, নিশ্চয়ই এটি এমন জিনিস যা তারা তৈরি করে এবং ধারণা করে থাকে যে এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের ভালবাসা সৃষ্টি করে। অতএব এটি যাদুর এক প্রকার। সাধারণ লোকে একে মন ফিরান ও মন গলিয়ে দেয়া নামে অভিহিত করে। প্রকৃতপক্ষে তা তাবীয-কবজের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা বিশেষ পন্থায় তৈরি করে যাদুকরই তাতে শিরকি মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়। যার ফলে তাদের ধারণা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসতে থাকে। তাই এটি এক ধরনের যাদু, আর যাদু হলো আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী।

৩। সকল প্রকার তাবীয নিষিদ্ধ যে ব্যক্তি তাবীযকে হালাল করার জন্য কোন ফাঁক ফোকর খুঁজবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বান্দা যদি স্বীয় অন্তর থেকে সমস্ত কিছুর ভরসাকে বের করে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ভরসা করে তবে তার আনন্দ, মুক্তি ও সফলতা রয়েছে।

"তামায়েম" বা তাবীয এমন জিনিসকে বলা হয় যা ছেলেমেয়েদের শরীরে লাগানো হয় যাতে তারা চোখ লাগা থেকে বাঁচতে পারে।[৪] ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের কোন অংশ হয় তাহলে কতিপয় সালফে, সালেহীন এটির অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ তাতে অনুমতি দেননি। তারা এটিকেও নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)।[৫]

শিরক মুক্ত ঝাড়ফুঁককে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) চোখ লাগা ও জ্বরের ক্ষেত্রে বৈধ বলেছেন। "তাগা" এমন একটি জিনিস যা স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এই বিশ্বাসে লোকেরা ব্যবহার করে।

রুওয়াইফি থেকে আহমদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

«يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ» (مسند أحمد: ٤/١٠٨، ١٠٩ وسنن أبي داود، الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ح:٣٦)

"আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) আমাকে বলেন, হে রুওয়াইফি, তুমি হয়তো দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। মানুষকে জানিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি দাড়ি বাঁধবে অথবা গলায় দড়ি ঝুলাবে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা অথবা হাড় দিয়ে শৌচ কার্য করবে, মুহাম্মাদ তার থেকে মুক্ত।"[৬]

সাঈদ বিন জুবায়ের (رحمه الله) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

৪। কল্যাণ আনার জন্য এবং তা অকল্যাণ দূর করার জন্য যা কিছুই ঝুলানো হবে তাই তাবীযের অন্তর্ভুক্ত।

৫। দলীল দ্বারা প্রমাণ ও রয়েছে যে, সকল প্রকার তাবীযই নিষিদ্ধ তবে যে ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ ঝুলাল সে শিরকে লিপ্ত নয়। কেননা সে আল্লাহরই গুণের-সিফতের অংশ। অর্থাৎ আল্লাহর কালাম ঝুলিয়েছে, সুতরাং সে তার অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য কোন মাখলুককে আল্লাহর সাথে শরীক করেনি।

৬। নিছক হার ব্যবহার নিষিদ্ধ নয় বরং যে হার অনিষ্টতা দূর করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয় সেটি শিরক বিধায় নিষিদ্ধ। "মুহাম্মাদ তার থেকে মুক্ত" বাক্যটি প্রমাণ করছে যে উক্ত কাজটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ছোট শিরক আর ছোট শিরক হল কবীরার অন্তর্ভুক্ত যেমন বড় শিরক কবীরার অন্তর্ভুক্ত।

«مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِّنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»(المصنف لابن أبي شيبة، ح:٣٥٢٤)

"যে ব্যক্তি কোন লোকের তাবীয কাটবে সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে।" ওয়াকী এটি বর্ণনা করেছেন।[৭]

ইব্রাহীম ওয়াকী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

«كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ»(المصنف لابن أبي شيبة، ح:٣٥١٨)

"সাহাবায়ে কেরাম কুরআনী ও অকুরআনী সকল তাবীযকে অপছন্দ করতেন।[৮]

৭। এতে তাবিজ কেটে ফেলার ফযীলত বর্ণনা হয়েছে কেননা তাবিজ ঝুলানো বা বাঁধা আল্লাহর সাথে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর ছোট শিরকের ব্যাপারে হুশিয়ারী এসেছে যে, সে জাহান্নামে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের গলা থেকে তাবিজ কাটল সে যেন তার গলাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করল। কেননা এ জঘন্য কাজের জন্য সে জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সে তাবিজ কেটে তার গলাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিল, অতএব তাকেও অনুরূপ প্রতিদান মিলবে, তার গলাকেও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা হবে। আমল যে ধরনের সওয়াবও সে ধরনেরই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গলাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে সে একটি গোলাম আযাদের সওয়াব পাবে।

৮। অর্থাৎ ইবনে মাসউদের সঙ্গীগণ সকল প্রকার তাবীযকে অপছন্দ করতেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ঝাড়ফুঁক ও তাবীযের ব্যাখ্যা।

২। তাগার ব্যাখ্যা।

৩। কোন পার্থক্য ছাড়াই শরীয়ত সম্মত নয় এমন ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও তাগা এই তিনটিই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪। চোখ লাগা ও জ্বরে শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক শিরক নয়।

৫। তাবিজ-কবজ কুরআন থেকে হলে তা শিরক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

৬। চোখ লাগা থেকে জীব-জন্তুকে রক্ষা করার জন্য রশি ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৭। যে রশি ঝুলাবে তার কঠোর শাস্তির বিধান।

৮। যে ব্যক্তি কোন লোকের তাবীয কাটবে তার ফযীলত।

৯। ইব্রাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এখানে আসহাব বলতে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদের সহচরবৃন্দ উদ্দেশ্য।

অধ্যায়-৮

যে ব্যক্তি কোন গাছ, পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়*

---

* এমন ধরনের কাজের বিধান কি? উত্তরঃ এটি শিরক। বরকত হচ্ছে কল্যাণের আধিক্য, স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্ন হওয়া। কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত হলো একমাত্র আল্লাহই বরকত দিয়ে থাকেন। আর সৃষ্টির মধ্যে একে অপরকে বরকত দিতে পারে না। আল্লাহর বাণীঃ

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ ﴾

অর্থঃ "বরকতময় ঐ স্বত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেন।" (সূরা ফুরকানঃ ১) অর্থাৎ ঐ স্বত্তার কল্যাণ সমূহ সুমহান প্রচুর ও স্থায়ী যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেন। তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ﴾

অর্থঃ "আমি ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা সফফাতঃ ১১৩) তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا ﴾

অর্থঃ (ঈসা আঃ বলেনঃ) "আর আল্লাহ আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন।" (সূরা মারইয়ামঃ ৩১) সুতরাং বরকত দানকারী একমাত্র আল্লাহই। অতএব কোন সৃষ্টির জন্য এ বলা বৈধ হবে না যে, আমি অমুক বস্তুতে বরকত দিয়েছি। অথবা আমি তোমাদের কাজকে বরকতময় করব অথবা তোমাদের আগমন বরকতময়; যেহেতু কল্যাণের আধিক্য, স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছন্ন হওয়া তাঁরই পক্ষ থেকে যাঁর হাতে সমস্ত কিছুর ইখতিয়ার। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ বস্তুর মধ্যে যে বরকত দিয়েছেন তা হয় স্থান অথবা সময়ের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে।
প্রথম প্রকারঃ যেমন বায়তুল্লাহ্ শরীফ, বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি। এ সকল স্থানে অফুরন্ত ও স্থায়ী কল্যাণ আছে। এর অর্থ এই নয় যে, এই গুলির মাটি ও দেয়াল মাসহ্ করতে হবে। কেননা খোদ এর মধ্যে বরকত নেই বরং সেখানে ইবাদত করে উক্ত বরকত অর্জন করতে হবে। এমনিভাবে হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথরও একটি বরকত মন্ডিত পাথর। যে ব্যক্তি এটি ইবাদত মূলক এবং অনুসরণ মূলক চুম্বন করবে সে রাসূলের আনুগত্যের বরকত লাভ করবে। ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কালো পাথর চুম্বন দেয়ার সময় বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর উপকারও করতে পারবে না। অনিষ্টও করতে পারবে না। তাঁর বাণী "তুমি উপকার করতে পারবেনা অনিষ্টও না" অর্থাৎ না তুমি কারো উপকার বয়ে আনতে পার আর না কারো অনিষ্টের কোন কিছু প্রতিহত করতে পার। অপরদিকে স্থানের বরকতের উদাহরণ হল রামযান মাস ও আল্লাহ্র মহিমান্বিত কতগুলি দিবস। এ সকল দিন ও স্থানের নিজস্ব কোন বরকত নেই; বরং বরকত রয়েছে এগুলোর ইবাদত ও বন্দেগীতে ও ফযীলতে, যা অন্য সময়ে নেই।
দ্বিতীয় প্রকারঃ মানুষের মধ্যে বরকত। আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের ব্যক্তি সত্ত্বায় বরকত নিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের দেহ বরকত মন্ডিত। হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম মহানবীর থুথু ও চুল থেকে বরকত নিতেন। এটি শুধু নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। আমাদের ক্ষেত্রে

আল্লাহ্‌র বাণী—

﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ﴾

অর্থঃ "তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্‌যা সম্পর্কে।"[১] (সূরা নাজমঃ ১৯)

এমন কোন দলীল পাওয়া যায়নি যে, তাদের থেকে মুসলমানেরা বরকত নিতেন। সাহাবী ও তাবেঈগণ খলীফা থেকে এ ধরনের কোন বরকত নিতেন না, এমন কি নবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর থেকেও অন্য সাহাবীরা বরকত নিতেন না। অতএব তাদের থেকে বরকতের ধরণ হলো আমলের বরকত স্বত্তার বরকত নয় যে বরকত নবী (ﷺ) থেকে নেয়া হত। অতএব আমরা বলব প্রত্যেক মুসলমানেরই বরকত রয়েছে কিন্তু তা স্বত্তার বরকত নয় বরং তাদের আমলের বরকত, তাদের ইসলাম, ঈমান, ইয়াকীন ও নবীর অনুসরণের বরকত ও সৎব্যক্তিদের অনুসরণ আলেমদের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ ও তাদের ইলম থেকে উপকৃত হওয়া ইত্যাদি। তবে তাদের স্পর্শ করে তাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে বরকত না জায়েয। মুশরিকগণ তাদের ভ্রান্ত মা'বূদদের সাথে সম্পর্ক গড়ে বহু কল্যাণ ও তার স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছন্নতা কামনা করে। তাদের রয়েছে বরকত গ্রহণের বহুমুখী পন্থা, যার সবগুলিই শিরকী বরকত গ্রহণ পন্থা। অনুরূপ গাছ-পালা, পাথর, বিভিন্ন স্থান, নির্ধারিত গুহা, কবর, পানির ঝর্ণা অথবা অন্য যে সব বস্তুতে অজ্ঞ লোকের বরকতের বিশ্বাস রাখে ও বরকতময় মনে করে তা শিরকের অন্তভুক্ত। গাছ-পালা, পাথর কবর অথবা বিভিন্ন স্থান থেকে বরকত গ্রহণ মহা শিরকের অন্তর্ভুক্তঃ যদি এ সবের বরকত এ বিশ্বাসে কামনা করা হয় যে, নিশ্চয়ই এই বৃক্ষ বা পাথর বা কবর যদি স্পর্শ বা সেখানে গড়াগড়ি দেয়া বা সেগুলির সাথে জড়াজড়ি করা হয় তবে তা আল্লাহর নিকট তার জন্য মধ্যস্থতা করবে। আর যদি তাতে এও বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে তা আল্লাহর নৈকট্যের উসীলা তবেও তা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নেয়া এবং মহা শিরক। জাহেলী যুগের লোকেরা যে সব বৃক্ষ ও পাথরের তারা ইবাদত করত সেগুলির এবং যে সব কবর থেকে তারা বরকত নিত সেক্ষেত্রে এ ধরণেরই ধারণা রাখত। তারা বিশ্বাস করত যে নিশ্চয়ই তারা যদি সেখানে আস্তানা গাড়ে অবস্থান নেয় ও তার সাথে জড়া জড়ি করে বা তার উপর ধুলা-বালি ছিটিয়ে দেয় তবে নিশ্চয়ই এই স্থান বা এ স্থানে যে রয়েছে বা যার আত্মা সেখানে সন্নিবেশিত সে তার জন্য মধ্যস্থতা করবে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾

অর্থঃ "যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে (তারা বলে) আমরা তাদের ইবাদত শুধু এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট করে দিবে।" (সূরা যুমারঃ ৩) আর উক্ত রবকত গ্রহণ ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্তঃ মনে করুন যদি কেউ কবরের মাটি এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে বা ছিটায় যে নিশ্চয়ই তা বরকতমত অতএব যদি তা শরীলে মাখে তবে তার শরীলও নিশ্চয়ই তার কারণে বরকতময় হবে। তবে তা ছোট শিরক হবে। কেননা শরীয়ত যাকে বরকতের কারণ সাব্যস্ত করেনি সে তা কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। গাছ, পাথর, কবর অথবা কোন স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা বড় শিরক।

১। 'লাত' হচ্ছে একটি সাদা পাথর যা তায়েফবাসীর নিকট ছিল। মহানবী (ﷺ)এর নির্দেশে ওটি ধ্বংস করে দেয়া হয়।

আবূ ওয়াকিদ আল্লায়সী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (ﷺ) সাথে হুনায়নে গেলাম। তখন আমরা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুশরিকদের একটি কুলগাছ[২] ছিল যেখানে তারা অবস্থান করত, সেখানে তাদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। ওটিকে "যাতু আনওয়াত" বলা হত। আমরা কুলগাছের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তাদের যেমন একটি যাতু আনওয়াত আছে আমাদের জন্যও তেমনই একটি যাতু আনওয়াত তৈরী করুন।[৩] তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বললেনঃ

'ওয্‌যা' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানের একটি গাছ যেখানে সৌধ নির্মাণ করা হয়। মক্কা বিজয়ের পর এটি কেটে ফেলা হয়। এখানে ছিল একজন মহিলা জ্যোতিষী যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জ্বিন হাযির করত। তাকেও হত্যা করা হয়।

﴿وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ﴾

অর্থঃ "এবং তোমরা কি তৃতীয় অন্য একটি জঘন্য দেবীর প্রতি লক্ষ্য করেছ।" (সূরা নাজমঃ ২০)

"মানাত" এটিও মুশরিকদের একটি দেবী। তাকে মানাত নামে অভিহিত করার কারণ হলো, তার সম্মানে সেখানে বেশি বেশি পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করা হত। যার জন্য মানাত বলা হয়। আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে উক্ত আয়াতের সামঞ্জস্য লাত ও মানাত হলো দু'টি পাথর ও ওয্‌যা হলো একটি বৃক্ষ। মুশরিকগণ এই তিনটির নিকট যা কিছু করত ঠিক ঐ ধরনের কর্মকান্ড তার পরবর্তী যুগের মুশরিকগণও পাথর, বৃক্ষ, গুহার নিকট যেয়ে থাকে। আর এর মধ্যে আরো মারাত্মক হলোঃ কবরকে মা'বূদ বানিয়ে সেখানে ইবাদত ও তার অভিমুখী হওয়া।

২। নির্দিষ্ট গাছটি সম্পর্কে মুশরিকদের তিনটি আকিদা-বিশ্বাস ছিলঃ (ক) তারা এটিকে সম্মান করত। (খ) তারা এখানে ভক্তির সাথে নৈকট্য লাভের আশায় অবস্থান করত। (গ) ঐ গাছে তাদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। এই আশা পোষণ করতঃ যে গাছটি থেকে অস্ত্রে বরকত চলে আসবে, যার ফলে তা অতি ধারাল হবে ও তার ব্যবহার কারীর জন্য অতি কল্যাণময় হবে তাদের এ কাজ ছিল মহা শিরক কেননা তাদের মধ্যে উক্ত তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩। সাহাবাদের মধ্যে যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিল তারা বলেঃ

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

তারা ধারণা করেছিল যে নিশ্চয়ই এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কালেমায়ে তাওহীদের দ্বারা ঐ কর্মের নাকচ হয় না, এই জন্য উলামায়ে কেরাম বলেনঃ কখনো কখনো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকটও কিছু কিছু শিরকের বিষয় গোপন থেকে যায়। যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতিপয় আরবী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলামে দীক্ষিত হন তাদের নিকটও ইবাদতের তাওহীদের এসব প্রকার অস্পষ্ট ছিল। হাদীসে বর্ণিত সাহাবাদের উক্ত আকাঙ্খার জবাবে বলেনঃ আল্লাহু আকবার! নিশ্চয়ই এটিই ভ্রান্ত পথ। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ঐ ধরনের কথাই বললে যা বনী ইসরাঈল মূসা (ﷺ) কে বলেছিলঃ (হে

মূসা) যেমন তাদের মা'বূদ রয়েছে আমাদের জন্যও অনুরূপ মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন।" নবী (ﷺ) সতর্কতা স্বরূপ তাদের আকাঙ্খাকে মূসা (ﷺ) এর জাতির আকাঙ্খার সাথে তুলনা করেন যে আকাঙ্খা তারা মূর্তিপূজারীদেরকে দেখে তারা মূসা (ﷺ) এর নিকট করেছিল যে, তাদের মত আমাদেরও এক মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন। উক্ত সাহাবীগণ তাঁদের আকাঙ্খাকে বাস্তবায়ন করেননি বরং যখন নবী (ﷺ) তাঁদেরকে এ থেকে বাধা দেন তাঁরা বিরত হয়ে যান, পক্ষান্তরে তাঁরা তা বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হত। কিন্তু তাঁরা যেহেতু শুধু মৌখিকভাবে চেয়েছিলেন, কার্যে বাস্তবায়ন করেননি, তাই তাঁদের এ একথা ছোট শিরকের অন্ত র্ভুক্ত ছিল। কেননা তাদের এ চাওয়াতে গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্কের বহিপ্রকাশ ঘটে। এই কারণে নবী (ﷺ) তাদেরকে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেননি। এর মাধ্যমে ও কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে মহা শিরকে মুশরিকগণ নিমজ্জিত ছিল তা শুধু জাতে আনওয়াত থেকে বরকত নেয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং সেখানে সম্মান প্রদর্শন, সেখানে অবস্থান ও ইতিকাফ এবং অস্ত্র ঝুলিয়ে বরকত গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে যখন কোন বৃক্ষ অথবা পাথর অথবা অন্যান্য বস্তু থেকে বরকত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি এ বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এ বস্তু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম এবং তার নিকট তারা অভাব তুলে ধরে অথবা সেখান থেকে বরকত গ্রহণ করলে অভাব প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আরো বেশি আশা থাকে তবে এটি হবে মহা শিরক। এ ধরনের কাজ করে থাকত জাহেলী যুগের লোকেরা।

বর্তমান যুগে যদি কবর-মাজার পূজারী ও নানা কুসংস্কারবাদীদের কৃতকর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূর্বের যুগের কাফের ও মুশরিকগণ লা'ত, উয্যা ও যাতে আনওয়াতে যা যা করত এবং তাদের ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস রাখত বর্তমানের এরা কবর-মাজারেও ঠিক ঐ ধরনের কর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে ঐ ধরনেরই বিশ্বাস রাখে। বরং কবর-মাজারের লোহার গ্রিল গুলির প্রতিও অনুরূপ বিশ্বাস রাখে। যে সব দেশে শিরক ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানের বিভিন্ন আস্তানায় দেখা যায় যে লোকেরা মাজারের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলিকে যখন স্পর্শ করে তখন তারা মনে করে যে তারা যেন দাফনকৃত ব্যক্তিকেই স্পর্শ করছে। অতএব তারা যেহেতু তার সম্মান করেছে তাই সে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করবে। আর এ ধরনের বিশ্বাস হলো আল্লাহর সাথে মহাশিরক। কেননা সে উপকার গ্রহণ ও অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়েছে এবং তাকে সে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছে। যেমনঃ পূর্বের লোকেরা করেছিল যারা বলেছিলঃ

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾

অর্থঃ "আমরা তো তাদের ইবাদত শুধু এই জন্যই করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট করে দিবে।" (সূরা যুমারঃ ৩)

আরো একটি লক্ষনীয় বিষয় যে ব্যাপারে ইতিপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে, কতিপয় লোক কোন কোন জায়গায় স্পর্শ করা নৈকট্য অর্জনের কারণ জ্ঞান করে থাকে, যেমনঃ কতিপয় অজ্ঞ লোককে দেখা যায়, সে হারাম শরীফ আসে এবং হারামের বাইরের দরজাগুলি বা দেয়ালের কোন অংশ বা কোন পিলার (স্তম্ভ) বরকতের জন্য স্পর্শ করছে, তার বিশ্বাস যদি হয় যে, এই খুঁটির আত্মা রয়েছে অথবা সেখানে কোন লোক দাফনকৃত রয়েছে অথবা কোন পবিত্র আত্মা এ

«اَللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسٰى: ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»(جامع الترمذي، الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، ح: ٢١٨٠ ومسند أحمد: ٥/ ٢١٨)

"আল্লাহু আকবার। এটি হচ্ছে (ভ্রান্ত জাতির) রীতি-নীতি। যার হাতে আমার প্রাণ আছে তার শপথ, তোমরা এমন কথা বললে যা বনী ইসরাঈল মূসা (عليه السلام) কে বলেছিল,

﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾

অর্থঃ "তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদেরও তেমনই উপাস্য নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা এক মূর্খ জাতি।" (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ১২৮)

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের জীবন পদ্ধতি মেনে চলবে। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সবের খেদমত করে থাকে এজন্য সে তা স্পর্শ করে তবে তা মহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সে যদি এ বিশ্বাসে স্পর্শ করে যে, এ জায়গা হলো বরকতময়, আর তা রোগ মুক্তির কারণ হতে পারে তবে তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরায়ে নাজমের আয়াতের তাফসীর।

২। তারা যে আরজি পেশ করেছিল তার স্বরূপ জানা।

৩। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা একাজ করেনি।

৪। তারা ভেবেছিল আল্লাহ্ এটি পছন্দ করেন তাই এর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে চেয়েছিল।

৫। এ বিষয়টি যদি সাহাবীদের নিকট অজানা থাকে তাহলে অন্যদের তা আরো স্বাভাবিকভাবে অজানা থাকতে পারে।

৬। সাহাবীদের জন্য যে সওয়াব ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি আছে তা অন্যদের নেই।

৭। মহানবী (ﷺ) তাদের ওযর গ্রহণ করেননি বরং তাদের উক্তির প্রতিবাদ করেছেন। এ কথার মাধ্যমে "আল্লাহু আকবার----অনুসরণ করছে। উপরোক্ত তিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "উদ্দেশ্য" এ কথা জানানো যে,

﴿ اَجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا ﴾

তাদের এ আরজি ছিল বনী ইসলাইলের আরজির অনুরূপ।

৯। এ বিষয়টিকে অস্বীকার করা সূক্ষ্মভাবে যা তাদের প্রতি অস্পষ্ট ছিল। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত যা তাদের প্রতি অস্পষ্ট ছিল।

১০। এটি ফতওয়ার ক্ষেত্রে একটি কসম। আর তিনি কোন কল্যাণ ব্যতীত কসম খান না।

১১। শিরকের স্তরের মধ্যে রয়েছে বড় ও ছোট, কারণ তারা এর ফলে মুরতাদ হয়ে যায়নি।

১২। "আমরা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছি" একথায় বুঝা যায় যে, বিষয়টি অন্যদের নিকট অজানা নয়।

১৩। যারা বিস্ময় প্রকাশার্থে তাকবীর ধ্বনি দেয়া পছন্দ করেনা, এটা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

১৪। ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কাজের পথ রুদ্ধ করে দেয়া।

১৫। জাহেলী যুগের লোকদের অনুকরণ করতে নিষেধাজ্ঞা।

১৬। শিক্ষা দেয়ার সময় রাগ করা।

১৭। "এটি একটি সর্বসম্মত নিয়ম (إنها السنن) বলে নবী (ﷺ) এক সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করেন।

১৮। মহানবীর একটি মুজিযা। কারণ, তিনি যেমনটি বলেছিলেন তেমনটিই ঘটেছিল।

১৯। আল্লাহ্ কুরআনে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের যে সকল বিষয়ে নিন্দা করেছেন সেগুলি আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২০। উলামাদের নিকট এটি স্বীকৃত যে, ইবাদতের ভিত্তি হল আল্লাহর নির্দেশের উপর (মনমত ইবাদত কবূল হবে না)। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে শতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। (من ربك) " তোমার রব কে" দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। (من نبيك) "তোমার নবীকে" এ অংশের গায়েবের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। (ما دينك) "তোমার দ্বীন কি" এ কথা তাদের "আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন।" আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত। তোমার দ্বীন তো তোমাকে শিরক করার নির্দেশ দেয় নেই। তাই তোমাকে শিরকের নির্দেশ প্রদানকারী কে?

২১। মুশরিকদের রীতি-নীতির মতোই আহলে কিতাবদের রীতি-নীতিও নিন্দনীয়।

২২। বাতিল আদর্শ ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না যে, তার অন্তরে সে আদর্শের কোন অংশ আর অবশিষ্ট নেই। এ কথা তার প্রমাণ-

((ونحن حدثاء عهدٍ بكفر))

অধ্যায়-৯

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা সম্পর্কিত বিষয় *

---

* আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করার ব্যাপারে হুশিয়ারী এসেছে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা। জবাই করার অর্থ হল রক্ত প্রবাহিত করা। জবাই করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। কার নামে জবাই করা হচ্ছে এবং কি উদ্দেশ্যে জবাই করা হচ্ছে। জবাই করার সময় "বিস্মিল্লাহ্" বললে তার অর্থ হয়ঃ আমি আল্লাহ্র নামে, সাহায্যে ও তাঁর বরকত কামনা করে জবাই করছি। জবাই করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল ইবাদত ধর্মী দিক। এ সকল বিবেচনায় এর চারটি অবস্থা হলঃ

প্রথমতঃ কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নামে জবেহ্ করা। এটিই হচ্ছে তাওহীদ, এটিই হচ্ছে ইবাদত। অতএব জবাইয়ের সময় দু'টি শর্ত জরুরীঃ প্রথমঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করবে, দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করবে। যেমনঃ কুরবানীর পশু, হজ্জে জবাইকৃত পশু, আকীকা ইত্যাদি। যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম না নেয় তবে তা হালাল হবে না। আর যদি জবাইকৃত পশু দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য না থাকে এবং অন্য কারো উদ্দেশ্যও না থাকে বরং তা মেহমানদারী বা তা নিজে খাবে এজন্য যদি জবাই করে থাকে, তবে জায়েয হবে, এতে শরীয়তের অনুমতি রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করেছে ও অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করেনি। অতএব তা আল্লাহর হুশিয়ারী ও নিষেধের আওতাভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র নামে জবাই করা এবং কবরবাসীর নৈকট্য লাভের আশা করা। এটি শিরক যেমনঃ সে বলে "বিসমিল্লাহ" আমি আল্লাহর নামে জবাই করছি। এবং সে জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করে ; কিন্তু এর দ্বারা তার নিয়ত হলো দাফনকৃত কোন নবী বা সৎব্যক্তির নৈকট্য অর্জন করা। সুতরাং যদিও সে আল্লাহর নামে জবাই করেছে তবুও এক দিক দিয়ে তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কেননা সে দাফনকৃত ব্যক্তির সম্মানেই রক্ত প্রবাহিত করেছে আল্লাহর জন্য নয়। কোন কোন গ্রাম বা শহরে দেখা যায় যে, তারা যদি কোন আগন্তুকের সম্মান প্রদর্শন করতে চায় তবে তারা চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে উট বা অন্য কোন প্রাণীর দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার সন্তুষ্টির জন্য তা জবাই করে ও তার আগমনের সময় রক্ত প্রবাহিত করে। এই জবাইতে যদিও আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় ; কিন্তু যেহেতু তার দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য থাকে এজন্য উলামায়ে কেরাম উক্ত কাজকে হারাম ফতোয়া দিয়েছেন। কেননা তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং তা খাওয়াও জায়েয নয়। যেহেতু জীবিত কারো সম্মানে জবাই করা ও রক্ত প্রবাহিত করা জায়েয নেই অতএব, কোন মৃত (নবী-অলী) ব্যক্তির সম্মানে জবাই করা তো অবশ্যই হারাম হবে। কেননা রক্ত প্রবাহিত করে শুধু এক আল্লাহরই সম্মান করা যেতে পারে। কেননা তিনিই রগ-শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল করান। অতএব এর মাধ্যমে ইবাদত ও সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করা এবং অন্যের নৈকট্যের আশা করা। এটি উভয় দিক থেকেই শিরক। যেমনঃ কেউ বলেঃ "মসীহের নামে" আর এ বলে সে তার হাত

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾

অর্থঃ "বল নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রভু আল্লাহ্‌র জন্যেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই।"[১] (সূরা আনআম, আয়াতঃ ১৬২)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

অর্থঃ "অতএব, তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।"[২] (সূরা কাউসার, আয়াতঃ ২)

জবাইয়ের জন্য চালিয়ে দিল এবং তার দ্বারা মসীহের নৈকট্য ও উদ্দেশ্য করল। এটি দুই দিক দিয়েই মহা শিরকঃ সাহায্য প্রার্থনার ও ইবাদতের শিরক। অনুরূপ কেউ যদি জিলানী, বাদভী, হুসাইন, যয়নব, খাজা ইত্যাদীর নামে জবাই করে। সাধারণত যাদের দিকে কতিপয় মানুষ ধাবিত হয় তারও বিধান একই। কেননা তাদের নামে জবাই করার সময় তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য তাদের নৈকট্য অর্জন হয়ে থাকে। এজন্য উক্ত দুভাবেই এক্ষেত্রে শিরক হয়ে থাকে।
চতুর্থতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করে তা আল্লাহ তায়ালার জন্য উৎসর্গ করা যা অতি বিরল। তবে কখনো এরূপ হয় যে, কোন অলির নামে জবাই করে তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা হয়। এ ধরনের কার্যকলাপই প্রকৃত পক্ষে সাহায্য প্রার্থনা ও ইবাদতের শিরক হয়ে থাকে। ফলকথাঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই ইবাদতের শিরক এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে পশু জবাই সাহায্য প্রার্থনায় শিরক হয়ে থাকে। আর এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾

অর্থঃ "আর যে জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না, কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শয়তানরা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে থাকে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে, যদি তোমরা তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে আনুগত্য কর, তবে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।" (সূরা আনআমঃ ১২১)
১। আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, জবাই করা নামায পড়া দু'টি ইবাদত। আর তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

আলী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) আমাকে চারটি কথা বলেছেনঃ

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»(صحيح مسلم، الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، ح:١٩٧٨)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করে আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ দেন। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ্‌ও তাকে অভিশাপ দেন। যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ দেন। যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে ফেলে আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ দেন।"[৩] মুসলিম

তারেক বিন শিহাব (ﷺ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلاَنِ عَلٰى قَوْمٍ لَّهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ، وَلَوْ

২। আল্লাহ্‌র যে কোন নির্দেশই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইবাদত এমন একটি ব্যাপক নাম যাতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত। অতএব আল্লাহ যেহেতু নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তা তাঁর নিকট প্রিয়। অনুরূপ জবাই করার যেহেতু নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং তা প্রিয় ও ইবাদত।

৩। উক্ত হাদীসটি আলোকপাতের উদ্দেশ্য হল, (রাসূলের বাণীঃ) "যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।" অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন ও অন্যের নৈকট্য অর্জনের জন্য তার প্রতি অভিশাপ। লা'নতের অর্থঃ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বিতাড়িত করা। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর স্বয়ং আল্লাহ লা'নত-অভিশাপ করেন তাকে তিনি স্বীয় বিশেষ রহমত থেকে বিতাড়িত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর আ'ম-ব্যাপক রহমত মুসলমান, কাফের সবার মধ্যে পরিব্যপ্ত। জেনে রাখা উচিত, যে পাপের সাথে অভিশাপের হুশিয়ারী জড়িত তা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য অর্জন ও সম্মানের উদ্দেশ্যে যেহেতু জবাই করা শিরক এই জন্য শিরকে পতিত ব্যক্তি আল্লাহর অভিশাপ ও হুশিয়ারী ও তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ারই উপযুক্ত।

ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ»(أخرجه أحمد في كتاب الزهد وأبونعيم في الحلية: ١/ ٢٠٣ كلاهما موقوفًا على سلمان الفارسي)

"মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে আবার মাছির কারণেই এক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।" লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) এটি কিভাবে? তিনি বললেন, দুই ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তাদের একটি মূর্তি ছিল। ওটিতে কোন নৈবেদ্য না দিয়ে কেউ তা অতিক্রম করতে পারে না। তারা এদের একজনকে বলল নৈবেদ্য পেশ কর। সে বলল। আমার কাছে পেশ করার মত কিছুই নেই। তারা বললো, একটি মাছি হলেও পেশ কর। সে একটি মাছি পেশ করলো। তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল। সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। তারা দ্বিতীয়জনকে বলল, নৈবেদ্য পেশ কর। তখন সে বলল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য কোন নৈবেদ্য পেশ করব না। তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। সে জান্নাতে প্রবেশ করল।[৪] আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন।

৪। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয়ই জবাই করে দেবতার নৈকট্য অর্জন জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যা বুঝা যায়, যে ঐ কাজ করেছে সে মুসলমান ছিল ; কিন্তু সে যা করেছে তার ফলে জাহান্নামে গেছে। অতএব এটি প্রমাণ করে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা আল্লাহ তায়ালার সাথে মহা শিরক। কেননা তাঁর বাণীঃ "সে জাহান্নামে প্রবেশ করে" প্রমাণ করে যে, অর্থাৎ তা তার জন্য স্থায়ীভাবে অপরিহার্য হয়ে যায়। উক্ত হাদীস থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্যের জন্য মাছির মত নগণ্য প্রাণী মানসিক-নজরানা পেশ করায় যখন ঐ ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার কারণে পরিণত হয়েছে, তবে যা কিছু তার চেয়ে উপকারী ও বড় তা নজরানা পেশ করাতে জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

উক্ত হাদীসে তাঁর বাণীঃ قرب "নজরানা পেশ কর" অর্থাৎ নৈকট্য অর্জনের জন্য জবাই কর। এ থেকে বুঝা যায় যে, ঐ জাতির লোকেরা উক্ত পথিকদেরকে সে কাজের জন্য বাধ্য করেনি, কেননা তার পূর্বে এরও বর্ণনা রয়েছে যে, তারা কাউকে নজরানা পেশ করা ব্যতীত ঐ রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে দিত না। তাতে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। অতএব সে যদি চাইত তবে বলতে পারত যেখান থেকে আমি এসেছি ফিরে যাব। তবে যদি বলা হয়, তারা নজরানা পেশ না করার জন্য হত্যার হুমকি দিয়েছিল, এজন্য সে ঐ কাজ করার জন্য বাধ্য ছিল আর বাধ্য করা অবস্থায় কোন কিছু ধর্তব্য নয়। এর উত্তর হলঃ এ ঘটনা ছিল আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আয়াতের ব্যাখ্যা। ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾

২। আয়াতের ব্যাখ্যা। ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জবাই না করে অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করে তার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপের সূচনা।

৪। যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয়। তোমরা অন্য লোকের পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলে নিজের পিতা-মাতাকেই অভিশাপ দেয়া হয়।

৫। যে ব্যক্তি কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় সেও অভিশপ্ত। এখানে অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে এমন কোন অপরাধ-অন্যায় করেছে, যাতে আল্লাহর হক (শাস্তি) ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে রক্ষা করতে পারে।

৬। যে ব্যক্তি জমির আইল পরিবর্তন করে ফেলে সে অভিশপ্ত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭। সুনির্দিষ্ট পাপের পর অভিশাপ এবং সাধারণ নাফরমানির অভিশাপে পার্থক্য রয়েছে।

৮। মাছির ঘটনা একটি বিরাট ঘটনা।

৯। কোন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য হিসেবে মূর্তির উদ্দেশ্যে মাছি পেশ করার কারণে হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তির জাহান্নামে প্রবেশ।

বাধ্য করা অবস্থায় কুফরী কালাম বা কুফরীকর্ম ঈমানের স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তার সাথে জায়েয হওয়া এই উম্মতের জন্য খাস। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য এর বৈধতা ছিল না।

১০। মুমিনদের অন্তরে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। মুমিন ব্যক্তি হত্যাকান্ডে কিভাবে ধৈর্য অবলম্বন করল? কিন্তু তাদের দাবীর কাছে সে মাথানত করেনি। অথচ তার কাছ থেকে শুধু বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবী করেনি।

১১। যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করল সেও মুসলমান ছিল। কারণ, কাফের হলে বলা হত না যে, মাছির কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।

১২। সহীহ হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, "জান্নাত তোমাদের কারোর জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও অনুরূপ।"

১৩। মূর্তিপূজারীদের নিকটও মনের আমলটাই বড় উদ্দেশ্য।

অধ্যায়-১০

যেখানে গায়রুল্লাহ্‌র নামে জবাই করা হয় সেখানে আল্লাহ্‌র নামে জবাই করা যাবে না*

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾

অর্থঃ "ওখানে কখনো দাঁড়াবে না।"[১] (সূরা তাওবাঃ ১০৮)

---

* এ অধ্যায়ে বর্ণিত مكان (মাকান) দ্বারা নির্দ্ধারিত স্থান ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান বুঝানো হয়েছে। আর এ দুইটি অর্থই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে স্থানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয় সেই স্থানের পার্শ্বে জবাই করা যাবে না। না খোদ সেই স্থানেই জবাই করা যাবে যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই হয়। কেননা তাতে উভয় অবস্থাতেই যারা গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করে তাদের সাথে মিল ও সাদৃশ হয়ে যায়। উক্ত মাসআলার উদাহরণঃ মনে করুন, যদি কোন স্থান, মাজার বা আস্তানায় গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে মুশরিক ও কুসংস্কার পন্থী ও বিদআতীরা কবরবাসীর বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তবে সেখানে নিশ্চয়ই তাওহীদবাদী মুসলমানের জন্য জবাই করা জায়েয হবে না, যদিও উক্ত জবাই একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়। কেননা এভাবে ঐ স্থানের মর্যাদা দেয়াতে ঐ সমস্ত মুশরিকদের সদৃশ হয়ে যায়, যারা ঐ সব স্থানে গায়রুল্লাহর জন্য বিভিন্ন ইবাদত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। সুতরাং যেখানে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হয় সেখানেই আল্লাহর উদ্দেশ্যেও জবাই করা শুধু হারাম ও নাজায়েয নয় বরং তা শিরকের বাহন, যাতে সে স্থানের তা'জীম সম্মান প্রদর্শিত হয়। যার হুকুম হল হারাম ও শিরকের মাধ্যম।

১। মুনাফিকদের তৈরি করা মসজিদে যিরার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কারণ, এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে। অতএব, যদি সেখানে নামায আদায় করা হত তবে তার দ্বারা নামাযে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হত যা না জায়েয। কেননা সেখানে নামায আদায়ে তাদেরকে সমর্থন করা, তাদের দল বৃদ্ধি এবং সাধারণ লোকদের জন্য জায়েয সাব্যস্ত হয়ে যেত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (ﷺ) ও মুমিনদেরকে মসজিদে যিরারে নামায আদায়ে নিষেধ করেন। অথচ নিশ্চয়ই তিনি (ﷺ) ও মুমিনগণ যদি সেখানে নামায আদায় করতেন তবে তা একমাত্র আল্লাহরই জন্য করতেন এবং সেখানে নামায আদায় করার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য দ্বীনের ক্ষতি সাধন বা বিভেদ সৃষ্টি বা আল্লাহর বিরোধিতা কোনক্রমে থাকতনা। কিন্তু তা সত্বেও তাঁদেরকে এই জন্যে সেখানে নামায আদায়ে নিষেধ করা হয়েছে, যেন তাতে মোনাফেকদের সাথে অংশ গ্রহণ ও সদৃশ না হয়ে যায়। অনুরূপ যে স্থানে গায়রুল্লাহর জন্য পশু জবাই করা হয় সেখানে আল্লাহ তায়ালার জন্যও পশু জবাই জায়েয নয় যদিও তার

সাবিত বিন দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত,

«نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَّذْبَحَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»(سنن أبي داود، الأيمان، باب ما يؤمر به من وفاء النذر، ح:٣٣١٣ والسنن الكبرى للبيهقي، ح:١٠/ ٨٣)

"এক ব্যক্তি মানত করল বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট জবাই করবে। সে মহানবী (ﷺ) কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করল। মহানবী (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন সে স্থানে এমন কোন মূর্তি ছিল কি, যেটি জাহেলী যুগে পূজা করা হত? লোকেরা বলল, না। তিনি বললেন, এখানে আহলে কিতাবের কোন উৎসব হত[2]? লোকেরা বলল, না। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বললেন,

---

দ্বারা একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত স্থানের সম্মান ও মুশরিকদের সাথে সদৃশ হয়ে যায়।

২। মহানবী (ﷺ) তার নিকট বিষয়টির ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। কারণ, এটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। পূর্বে এখানে কোন জাহেলী যুগের মূর্তি থেকে থাকলেও সেখানে জবাই করা জায়েয হবে না- এ কথা বলার উদ্দেশ্যেই হাদীসটি এখানে আনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণীঃ

فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا

ঈদঃ ঈদ এমন একটি স্থান বা সময়কে বলা হয় যার দিকে বার বার ফিরে আসা হয়, যা বার বার ফিরে আসে। সুতরাং কোন জায়গাকে ঈদ এই জন্য বলা হয় যে, সেখানে লোকদের বার বার আগমন ঘটে এবং একটি নির্দ্ধারিত সময়ে তার দিকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে। অনুরূপ কালকেও ঈদ বলা হয় কেননা তা এক নির্ধারিত সময়ে বার বার প্রত্যাবর্তন করে। অতএব তাঁর বাণী "সেখানে কি তাদের কোন ঈদ হত?" অর্থাৎ স্থানের ঈদ ও কালের ঈদ। আর মুশরিকদের ঈদ সমূহ চাই স্থান সূচক ঈদ হোক বা কাল সূচক। তাদের শিরকী ধর্মের উপরেই তার ভিত্তি হবে। অর্থাৎ তারা তাদের ঈদ সমূহে শিরকি ইবাদত সমূহই পালন করে থাকবে এবং ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে তারা অন্যান্য অনেক কাজ করে থাকে সেখানকার সবচেয়ে বড় কাজ হলো গায়রুল্লাহর নৈকট্যের জন্য জবাই করা ও রক্ত প্রবাহিত করা। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, মুশরিকরা যেখানে গায়রুল্লাহর নৈকট্যের জন্য জবাই করে সেখানে তাদের সাথে শরীক হয়ে তাদের প্রকাশ্যে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কোন ক্রমেই জায়েয হবে না। যদিও সেখানে একমাত্র আল্লাহরই

তোমার মানত পূর্ণ কর।[3] কারণ, আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে কোন মানত পূর্ণ করা যাবে না এবং আদম সন্তানেরা মালিকানায় যে জিনিস নেই তাতেও। (হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছে এবং এটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে।)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। এ আয়াতের তাফসীর। ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾

২। অবাধ্যতা ও আনুগত্যের মাধ্যেমে কখনো কখনো জমীন প্রভাবিত হয়।

৩। সন্দেহযুক্ত মাসআলাকে স্পষ্ট মাসআলার দিকে রুজু করা যাতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

৪। প্রয়োজনে মুফতীর পক্ষ থেকে প্রশ্নকারীর নিকট কোন বিষয়ের বিশদ বর্ণনা চাওয়া।

৫। মানত পূর্ণ করার জন্য কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করায় দোষ নেই- যদি তাতে নিষিদ্ধ বস্তু না থাকে।

৬। ঐ স্থানে জাহেলী যুগের কোন মূর্তি থাকলে তা নিষিদ্ধ হবে-যদিও সেটি সরিয়ে ফেলা হয়।

৭। মুশরিকদের কোন উৎসব থাকলে সেখানে কৃত মানত পূর্ণ করতে হবে না, তা বন্ধ করার পরও সেখানে মানত নিষিদ্ধ।

নৈকট্যের জন্য হয়ে থাকে অথবা একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যেই নামায আদায় হোকনা কেন?

৩। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত ব্যক্তিকে বলেনঃ "তোমার মানত পূর্ণ কর কেননা আল্লাহর নাফরমানীতে কোন মানত পূর্ণ করা যাবে না.." উলামায়ে কেরাম বলেনঃ হাদীসের فأوف এর (ফা) ف এই কথাই প্রমাণ করে যে এই মানত পূর্ণ করার বৈধতার কারণ হলো এই মানতে আল্লাহর নাফরমানী নেই। আর নবী (ﷺ) এর ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যাখ্যা দাবী ঐ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যেখানে কোন মূর্তি পূজা হয় অথবা মুশরিকদের কোন ঈদ-উৎসব হয় সেখানে আল্লাহর জন্য জবাই করাও আল্লাহর নাফরমানীর অন্তর্ভুক্ত।

৮। মুশরিকদের উৎসব স্থলে মানত করলে তা পূর্ণ করতে হবে না। কারণ, তা অবাধ্যতা।

৯। মুশরিকদের উৎসব ও মেলার সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে সতর্কতা। যদিও তা পালন করার উদ্দেশ্য না থাকে।

১০। নাফরমানীর কাজে কোন মানত নেই।

১১। আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় সে ক্ষেত্রে কোন মানত নেই।

অধ্যায়-১১
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোর উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾

অর্থঃ "তারা মানতপূর্ণ করে।"[1] (সূরা দাহরঃ ৭)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ﴾

অর্থঃ "আর তোমরা যা কিছুই খরচ কর আর যে কোন মানতই কর, আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা বাকারাহঃ ২৭০)

সহীহ হাদীসে আছে, আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ»(صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة. الخ، ح:٦٦٩٦، ٦٧٠٠؛ وسنن أبي داود، الأيمان والنذور، باب النذر في المعصية، ح:٣٢٨٩)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করবে সে তার আনুগত্য করবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করার মানত করবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।"[2]

১। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানত পূর্ণকারীদের প্রশংসা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে মানত শরীয়তসম্মত ও আল্লাহর প্রিয় ও ইবাদত। আর যেহেতু এটি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এজন্য তা গায়রুল্লাহর জন্য পালন করা মহা শিরক।

২। এ হাদীসে জায়েয মানত পূর্ণ করার নির্দেশ রয়েছে, এ থেকে বুঝা যায়, এটি আল্লাহর প্রিয় ইবাদত কেননা যা কিছু ওয়াজিব তাই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং যা কিছু তার মাধ্যম সেগুলিও ইবাদত অতএব করার মাধ্যমও মানতেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি মানতই না মানা হয় তবে

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২। কাজটি আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে প্রমাণিত হলে সেটিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দিকে রুজু করা শিরক।

৩। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জায়েয নয়।

পূর্ণইবা কি হবে? এজন্যে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, মানুষ যে মানতের ইবাদতকে নিজেই নিজের উপর অপরিহার্য করেছে। রাসূলের বাণীঃ

ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীর মানত করবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।" তা হবে মানুষের নিজের উপরে নিজে আল্লাহর নাফরমানীকে অপরিহার্য করে নেয়া কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ পাপাচারের সাথে সংঘর্ষিক বরং এ ধরনের লোকের জন্য শপথের কাফফারা অপরিহার্য হয়ে যায়। যার বিস্তারিত বর্ণনা ফেকাহ্ কিতাব সমূহে রয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালার জন্য মানত করা এক মহা ইবাদত এবং গায়রুল্লাহর নামেও মানত করা ইবাদত। অতএব গায়রুল্লাহর জন্য মানতকারী যখন স্বীয় মানত পূর্ণ করে তখন সে গায়রুল্লাহরই ইবাদত করল (যা মহা শিরক) পক্ষান্তরে আল্লাহর জন্য মানতকারী যখন স্বীয় মানতপূর্ণ করে তখন সে আল্লাহরই ইবাদত করে।

অধ্যায়-১২

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক *

---

* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা হলো মহা শিরক। আরবী ভাষায় "ইস্তি আযাহ" শব্দ এসেছে। এর অর্থঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ এমন কিছু কামনা করা যা অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দেয়। তলব-চাওয়া হলো, অভিমুখী হওয়া ও দোয়ার একপ্রকার কেননা এর দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং যার থেকে কিছু চাওয়া হয় সে অবশ্য প্রার্থনা কারীর চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে উঁচু হয়ে থাকেন। এজন্য তার দিকে ক্রিয়া সম্পন্ন করাকে দোয়া বলা হয়। এই জন্য প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ আশ্রয় চাওয়ার দোয়া করা। আর যখন তা দোয়া অতএব ইবাদতের ও অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক প্রকার ইবাদত আল্লাহর জন্য নির্ধারিত যার উপর সবারই ঐক্যমত এবং কুরআনের আয়াত সমূহ ও ঐ কথারই প্রমাণ বহন করে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই সমস্ত মসজিদ আল্লাহরই, অতএব তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা জ্বিনঃ ১৮)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾

অর্থঃ "আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দেন যে, তাঁকে ব্যতীত কারো ইবাদত করো না।" (সূরা ইসরাঃ ২৩)

বরং প্রত্যেক ঐ সমস্ত দলীল যাতে একমাত্র আল্লাহরই নিকট দোয়া করার কথা বা তাঁরই ইবাদত করার কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলি বিশেষ করে আলোচ্য মাসআলারই দলীল।

যে আশ্রয় প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর জন্য উপযোগী তার তাৎপর্য হলোঃ তার মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় আমল অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ্য আমল বলতে বুঝায় অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বা তা থেকে মুক্তি পাওয়া। আর অপ্রকাশ্য আমল বলতে বুঝায়ঃ আন্তরিক আকর্ষণ, প্রশান্তি, অস্থিরতা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তার নিকটেই তুলে ধরা এবং স্বীয় হেফাযত ও মুক্তির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার নিকটেই সোপর্দ করা। আর এ ধরনের আশ্রয় প্রার্থণা ঐক্যমতে আল্লাহর নিকট ব্যতীত আর কারো নিকট জায়েয নেই।

আর যদি বলা হয় যা কিছু মাখলুক-সৃষ্টির সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত তার আশ্রয় প্রার্থনা মাখলুকের নিকট জায়েয। এ তো এক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ থাকার ভিত্তিতেই জায়েয। আর এ আশ্রয় প্রার্থনার অর্থ হলো যে, মাখলুক থেকে আশ্রয় শুধু মৌখিক হয় ; কিন্তু আন্তরিক সম্পর্ক ও স্থিরতা আল্লাহরই সাথে হয়ে থাকে এবং তার এরূপ সৎখেয়াল থাকে যে, উক্ত মাখলুক শুধুমাত্র এক্ষেত্রে একটি কারণ স্বরূপ, আল্লাহই প্রকৃত আশ্রয়দাতা। সুতরাং এ আশ্রয় প্রার্থনা হলো প্রকাশ্য আর প্রকৃত ও

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾

অর্থঃ "কয়েকজন পুরুষ লোক কয়েকজন পুরুষ জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত ফলে তারা তাদের ভীতি ও উত্তেজনাকে বাড়িয়ে দিল।"[1] (সূরা জিনঃ ৬)

খাওয়ালা বিনতে হাকীম (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি কোন স্থানে উপনীত হয়ে বলবে- ((أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلـــق)) (অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ দ্বারা আশ্রয় চাই। প্রত্যেক ঐ জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।) ঐ স্থান থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[2] মুসলিম

অপ্রকাশ্য আশ্রয় প্রার্থণা তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয় না। অতএব ব্যাপার যদি এরূপ হয় তবে তা জায়েয, নতুবা নয়। এর মাধ্যমেই কুসংস্কারবাদী বাতিল পন্থীদের ঐ মত বাতিল, তারা যে মনে করে মৃত্যু, জ্বিন ও অলীদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা যেতে পারে যার মধ্যে তাদের সাধ্য রয়েছে। পক্ষান্তরে নিশ্চয়ই আল্লাহই তো তাদের চেয়ে সমর্থবান।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকারী হিসেবে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা তাওহীদ পরিপন্থী কাজ। যে সকল অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা শিরক। পক্ষান্তরে যে সকল সাধারণ মানুষের ক্ষমতা আছে সেগুলি তার নিকট প্রার্থনা করা শিরক নয়।

১। আয়াতে বর্ণিত رهقــا এর অর্থ হলোঃ তাদের অন্তরে এমন ভাবে ভয়-ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে যাতে তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে। আর এ বিপদগ্রস্ত তারা দৈহিকভাবে হয়েছে এবং আত্মীকভাবেও। এ বিপদ তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ ছিল। আর শাস্তি অবতীর্ণ হয় সাধারণত কোন পাপের কারণেই। সুতরাং উক্ত আয়াতে তাদের দোষ প্রমাণিত হয়। আর তাদেরকে এই জন্য দোষারোপ করা হয় যে, তারা এই ইবাদতকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন যে, তাঁকে ব্যতীত আর অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করার। কাতাদাহসহ কতিপয় সালাফী বলেছেনঃ (رهقاً) শব্দের অর্থ হচ্ছে পাপ। একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা পাপের কাজ।

২। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর কথামালা দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করার ফযীলত বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾

অর্থঃ "তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সূরা ফালাক-২) এখানে সৃষ্টজীবের অনিষ্টতা উদ্দেশ্য। কারণ, এমন সৃষ্টজীব ও রয়েছে যাতে কোন অনিষ্টতা নেই। যেমনঃ ফেরেশ্‌তা, নবী ওলী প্রমুখ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা জিনের আয়াতের তাফসীর।

২। গায়রুল্লাহর আশ্রয় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

৩। এই দোয়া দ্বারা আলেমগণ এই মর্মে দলীল পেশ করতে চান যে, আল্লাহ্‌র কথামালা মাখলুক বা সৃষ্টজীব নয়। কারণ, সৃষ্টজীবের নিকট সকাতরে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক।

৪। ছোট হওয়া সত্ত্বেও এ দু'আটির ফযীলত।

৫। কোন কাজে দুনিয়াবী উপকার হলেই বলা যাবে না বা এ কথা প্রমাণ করে না যে, উহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অধ্যায়-১৩

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আর্তনাদ করা অথবা দু'আ করা শিরক*

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴾

---

*মূলে (ইস্তেগাসা) শব্দ রয়েছে। এর অর্থ ফরিয়াদ বা আর্তনাদ করা। যে বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে অন্যের নিকট আর্তনাদ করা বড় শিরক। তবে যে বিষয়ে মানুষের ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে তার নিকট আর্তনাদ করা জায়েয যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা মূসা (ﷺ) এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ

﴿ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ ﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মূসার (ﷺ) গোত্রের ছিল সে তার শত্রুর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করল।" (সূরা আল-কাসাসঃ ১৫) "দু'আ" দুই প্রকারঃ (ক) আল্লাহ্‌র নিকট কোন কিছু ভিক্ষা করা, অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়ার জন্য হাত উঠিয়ে তাঁকে আহ্বান করা। আমরা সাধারণত একে দোয়া বলে জানি। (খ) ইবাদতে দু'আ। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই সমস্ত মসজিদই আল্লাহর জন্য অতএব তোমরা তার সাথে কাউকে ডেকোনা।" (সূরা জ্বিনঃ ১৮) অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আর অন্য কারো ইবাদত করো না এবং আল্লাহর সাথে আর অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করো না। যেমন নবী (ﷺ) বলেনঃ "দোয়া প্রার্থনাই হলো ইবাদত।"

উভয় প্রকার দোয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অতএব ইবাদতের দোয়া এমন হবে যেমন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করে বা যাকাত দেয় কেননা ইবাদতের যে কোন প্রকারই হোকনা কেন তাকে দোয়াই বলা হয় কিন্তু এই দোয়া ইবাদত হিসেবেই হয়ে থাকে। যখন এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতএব কুরআনী প্রমাণ পঞ্জি এবং ইমাম ও আলেমদের পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রমাণাদীকেও বুঝার জন্য উল্লেখিত ব্যাখ্যা ও প্রকারভেদ অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে, কেননা শিরক ও বিদআত বিস্তারকারীগণ চাওয়ামূলক দোয়ার ব্যাপারে আগত আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা বা চাওয়া মূলক দোয়া এবং ইবাদত মূলক দোয়াতে কোন অসমাঞ্জস্যতা নেই উভয়েরই পরস্পরে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। প্রার্থনা মূলক দোয়া হলো ইবাদতের একটি প্রকার এবং ইবাদত মূলক দোয়াতেও এ জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর নিকট উক্ত ইবাদত কবূলের জন্য প্রার্থনাও করা প্রয়োজন।

অর্থঃ "আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কোন কিছুকে ডাকিও না যা তোমার কোন উপকার ও অপকার করতে পারেনা। তুমি যদি এরূপ কর তাহলে অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ যদি তোমার কোন ক্ষতিসাধন করেন তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা দূর করার নেই।"[১] (সূরা ইউনুসঃ ১০৬-১০৭)

১। উক্ত আয়াতে ولا تدع من دون الله (আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে আহ্বান কর না।) (ولا تدع) দ্বারা নিষেধাজ্ঞা বুঝান হয়েছে, এখানে প্রার্থনা ও ইবাদত মূলক উভয় দোয়া নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবও এ আয়াত দ্বারা এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, কোন ব্যক্তির জন্য এটা জায়েয নাই যে সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট প্রার্থনামূলক হোক আর ইবাদত মূলকই হোক দোয়া করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো উক্ত নিষেধাজ্ঞার সম্বোধন কৃত ব্যক্তিত্ব হলেন মুত্তাকীদের ইমাম তাওহীদ পন্থীদের ইমাম। আল্লাহর বাণীঃ مـــن دون الله "আল্লাহকে বাদ দিয়ে" দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্যঃ কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করে আহ্বান করনা। আর দ্বিতীয়তঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে আহ্বান কর না। مالا ينفعك ولا يضرك আয়াতে (মা) শব্দ এসেছে। এর অর্থ 'যা'। 'যা' বলতে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হতে পারে। যেমন, ফেরেশ্‌তা, নবী প্রমুখ। আবার বুদ্ধিহীন সৃষ্টিও হতে পারে। যেমন, মূর্তি, গাছ, পাথর প্রভৃতি, আয়াতে (فإن فعلـــت) অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যদি কাউকে আহ্বান কর, যে তোমার কোন উপকার ও কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। (فإنك إذًا) অর্থাৎ সেই আহ্বানের কারণে (من الظـــالمين) অর্থাৎ যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এখানে 'যুলুম' বলতে শিরক উদ্দেশ্য। যখন নবী (ﷺ) এর ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর নিকট থেকেও যদি শিরক প্রকাশ পায় তবে তিনি নিশ্চয়ই যালেম ও মুশরিক হয়ে যাবেন, অথচ যার মাধ্যমে আল্লাহ তাওহীদকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তবে যে ব্যক্তি পাপাচার থেকে মুক্ত নয় তার জন্য এটি মারাত্মক হুশিয়ারী। কেননা গায়রুল্লাহকে আহ্বান করার জন্য সে বিনা বাক্যে যালেম ও মুশরিক হয়ে যাবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা অন্তর থেকে শিরকের সমস্ত শিকড় কেটে দেয়ার জন্য বলেনঃ

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ﴾

অর্থঃ "আর আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতিসাধন করেন তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা দূর করার নেই।" (সূরা ইউনুসঃ ১০৭)

যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে তবে তা কে দূরীভূত করবে? তিনিই তো যিনি আপনার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন এবং সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। এর মাধ্যমে গায়রুল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার দৃঢ়ভাবে নাকচ সাব্যস্ত হয়েছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বিষয় মানুষের সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত তার জন্য মানুষের নিকট ধাবিত হওয়া জায়েয। যেমনঃ সাধারণ সাহায্য কামনা, পানি চাওয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এ জন্যই জায়েয রয়েছে যে আল্লাহ তায়ালাই অনুমতিতে সে

﴿ فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদত কর।"[2] (সূরা আনকাবূত, আয়াতঃ ১৭)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴾

অর্থঃ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে তার চেয়ে আর কে বেশী পথভ্রষ্ট হতে পারে অথচ সে তার ডাকে সাড়া দিবে না কিয়ামত পর্যন্ত।"[3] (সূরা আহকাফ, আয়াতঃ ৫)

আল্লাহ্‌র বাণী–

ঐ পরিমাণ প্রয়োজন মিটানোর মাধ্যম হওয়ার সমর্থ অর্জন করেছে অথচ প্রকৃত পক্ষে তো আল্লাহই যাবতীয় সমস্যা দূরকারী। আয়াতের শব্দ بضـر "কোন প্রকার ক্ষতি" অনিষ্ট, যার ফলে সব ধরনেরই ক্ষতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনি ক্ষতি, পার্থিব ক্ষতি, শারীরিক ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি ও পারিবারিক ক্ষতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর সব ধরনের ক্ষতি দূরীভুতকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ।

২। আয়াতটিতে শব্দগুলি আগে-পিছে করে সাজানো হয়েছে। উলামায়ে কেরাম বলেনঃ যে শব্দ পরে সংযোগ হওয়ার তাকে পূর্বে সংযোগ করাতে তাখসীসের (বা নির্দিষ্টের) ফায়দা দেয়। যার ফলে– فابتغوا عنـد الله الـرزق এর অর্থ দাঁড়ায় "তোমরা আল্লাহরই নিকট রুযী তলব কর" আর অন্যের নিকট রুযীর জন্য ফরিয়াদ করনা। রুযী শব্দটি ব্যাপক, এর মধ্যে প্রত্যেক ঐ বস্তুই অন্ত র্ভুক্ত যা মানুষকে দেয়া হয়। যেমনঃ স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুস্থতা ইত্যাদি। অতপর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ واعبدوه "এবং তাঁরই ইবাদত কর" যেন এতে প্রার্থনা ও ইবাদত মূলক উভয় দোয়া অন্ত র্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩। এই আয়াতে ঐ লোকদের আহ্বান সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এবং কোন জীবিতকে বাদ দিয়ে মৃতদেরকে আহ্বান করে একেবারে নিকৃষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে এবং স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে তারা মৃতদের দিকে ধাবিত, মূর্তি, বৃক্ষ ও পাথরের দিকে নয় তাই إلى يوم القيامـة বলে কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এতো মৃতদের ক্ষেত্রে কেননা মৃতরা তো যখন কিয়ামত হবে পুনরুত্থিত হবে ও শুনা শুরু করবে। আয়াতে مـن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা জ্ঞান সম্পন্নের প্রতি প্রয়োগ হয় আর তারা হলো মানুষ যারা কথা বলে ও তাদের সাথেও কথা বলা হয়, তারা জানে (এখানে মৃত ব্যক্তি উদ্দেশ্য।)

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴾

অর্থঃ "নিরূপায় ব্যক্তি যখন তাঁকে ডাকে তখন কে তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং অনিষ্টতা দূর করে দেয়।"[4] (সূরা নামলঃ ৬২)

তাবারানী তাঁর ইসনাদে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (ﷺ) এর যুগে একজন মুনাফিক ছিল। সে ঈমানদারদের কষ্ট দিত। তাদের একজন বলল, চল, আমরা এই মুনাফিক থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।[5] তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না ; বরং আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।[6]

৪। এখানে প্রার্থনামূলক দু'আ উদ্দেশ্য। যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। কখনো আর্তনাদের পর আবার কখনো আর্তনাদ ছাড়াই আল্লাহ সৃষ্টি জীবের অনিহা দূর করেন। উক্ত আয়াতে أإله مع الله "তবে কি আল্লাহর সাথে আরো মা'বূদ রয়েছে"? এটি অস্বীকৃতি সূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আর কোন মা'বূদ নেই। যাকে আহ্বান করা যাবে বা যা কিছু আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাওয়া যাবে।

৫। আবূ বকর (رضي الله عنه) মহানবীর (ﷺ) এর নিকট গিয়ে আর্তনাদ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এটি জায়েয। কারণ, মহানবীর জীবদ্দশায় তিনি আর্তনাদ শুনে তাদের কষ্ট দূর করতে সক্ষম ছিলেন। তাই সেটি মুনাফিককে হত্যার মাধ্যমে হোক অথবা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে। এ পরিস্থিতিতেও নবী (ﷺ) তাদেরকে আদব শিক্ষা দেন এবং বলেনঃ "আমার দ্বারা ফরিয়াদ করা যায় না, ফরিয়াদ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই করতে হয়।"

৬। মুসলমানরা তাদের এ বিপদে রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেনঃ তাদের প্রথমতঃ আল্লাহর নিকট আর্তনাদ ফরিয়াদ করা ওয়াজিব যদিও বিষয়টি তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতার আওতায় ছিল।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সাহায্য চাওয়ার সাথে দু'আকে আত্‌ফ করার ব্যাপারটি কোন আম বস্তুকে খাছ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২। ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ এর তাফসীর।

৩। গায়রুল্লাহর নিকট আর্তনাদ ও দু'আ করা বড় শিরক।

৪। সবচেয়ে ভালো লোকও যদি একাজ অন্যের সন্তুষ্টির জন্য করে তাহলে সেও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৫। ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ﴾ এর পরবর্তী আয়াতের তাফসীর।

৬। গায়রুল্লাহকে আহ্বান করায় দুনিয়ায় কোন উপকার হয় না অথচ এটি কুফরী কাজ।

৭। তৃতীয় ﴿فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ﴾ আয়াতের তাফসীর।

৮। জীবিকা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট চাইতে হবে, তেমনিভাবে জান্নাত একমাত্র তাঁরই নিকট চাইতে হবে।

৯। চতুর্থ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ আয়াতের তাফসীর।

১০। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে যে ব্যক্তি ডাকে তার চেয়ে বড় গোমরাহ্ আর কেউ নেই।

১১। আল্লাহকে বাদ দিয়ে (যাকে ডাকা হয়) আহ্বানকারীর আহ্বান সম্পর্কে সে উদাসীন।

১২। এ ধরনের ডাক বা আহ্বানের ফলে আহুত ব্যক্তি ও আহ্বানকারীর মধ্যে (কিয়ামতের দিন) বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

১৩। গাইরুল্লাহকে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪। কিয়ামতের দিন আহুত ব্যক্তি এ ধরনের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।

১৫। এ সকল বিষয় ঐ ব্যক্তির গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ।

১৬। পঞ্চম ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ আয়াতের তাফসীর।

১৭। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মূর্তি পূজারীরা স্বীকার করে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নিরুপায় ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেয় না। তাই তারা দুঃখ কষ্টের সময় নিখাদ মনে তাঁকেই ডাকে।

১৬। মুহাম্মাদ (ﷺ) কর্তৃক তাওহীদের সংরক্ষণ ও আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর আদব শিষ্টাচার বজায় রাখা।

অধ্যায়-১৪

অক্ষমকে আহ্বান করা শিরক

আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾

অর্থঃ "তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা নিজেদের সাহায্যেরও ক্ষমতা রাখে না।"* (সূরা 'আরাফঃ ১৯১-১৯২)

---

* বিগত অধ্যায় গুলির পর এই অধ্যায়ের অবতারণা হলো উত্তম অবতারণা এবং জ্ঞানের ও পান্ডিত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনিই উপযুক্ত হওয়ার দলীল হলো, মানুষের স্বভাবজাত চরিত্রে বদ্ধমূল রয়েছে যে প্রভুত্ব-প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তিনিই একক। সুতরাং স্বভাবজাত চরিত্র, বাস্তবতা ও যুক্তি সব ধরনের দলীলই প্রমাণ করে যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহই তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন। জীবিকা দেন, মালিকানা একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো সকল বিষয়ে কোনই ক্ষমতা নেই। এমনকি সৃষ্টি জীবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও এ সকল বিষয়ে কোনই ক্ষমতা রাখেন না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "এ ব্যাপারে আপনার কোন ইখতিয়ার নেই।" যখন নবী (ﷺ) এর কোন ক্ষেত্রে ইখতিয়ার নেই তবে এমনকে রয়েছে যার সর্বক্ষেত্রে ইখতিয়ার রয়েছে? তিনি তো একমাত্র আল্লাহ। অতএব, সে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্রই ইবাদত করা উচিত সকল সৃষ্টজীবের। যখন নবী (ﷺ) থেকে ঐ বিষয় নাকচ হয়ে গেল তবে তাঁর চেয়ে নিম্নদের থেকে ঐ বিষয় নাকচ হবেই। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরস্থদের প্রতি বা সৎব্যক্তি, নবী বা ওলীদের দিকে ধাবিত হয়, তাদের অভ্যন্তরে ধারণা হয় যে নিশ্চয়ই তাঁদের ও কর্তৃত্ব রয়েছে। যেমনঃ তাঁরাও রুযীর ব্যবস্থা করতে পারেন বা তাঁরা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই মধ্যস্থতা ও সুপারিশ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তা অতিভ্রান্ত কথা কেননা তাঁরাইতো প্রতিপালিত ও রুযী প্রাপ্ত। তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে যারা তাদের নিকট চাই তাদেরকে তারা সাহায্য করতে অক্ষম। তাঁদের কোনই ক্ষমতা নেই। কুরআন মাজীদে বহু প্রমাণ রয়েছে যে, ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত হলো আল্লাহ তায়ালা, তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। আর ঐ সমস্ত দলীলের আওতায় কোন কোনটিতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের তাওহীদে রুবুবিয়াতে স্বীকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। এ ধরনের দলীল সমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তোমরা যে স্বত্ত্বার জন্য রুবুবিয়াত সাব্যস্ত কর ইবাদতেরও তিনিই উপযুক্ত। কুরআন মাজীদের দলীল সমূহে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই তো স্বীয় রাসূল (ﷺ) অলীদেরকে তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কতিপয় কুরআনী দলীলে সৃষ্ট জীবের দুর্বলতাও সাব্যস্থ হয়েছে এবং সাব্যস্থ করা হয়েছে যে, জীবিত করার ক্ষেত্রে মাখলুকের কোন ইখতিয়ার নেই, বরং আল্লাহ

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ﴾

অর্থঃ "আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মা'বূদকে ডাকে যারা সামান্য কোন কিছুর মালিক নয়।"[১] (সূরা ফাতিরঃ ১৩)

আনাস (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে আছে। তিনি বলেনঃ

«شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ ﴾ (صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة أحد، ح: ١٧٩١ ومسند أحمد: ٣/٩٩، ١٧٨)

"উহুদের দিন মহানবী (ﷺ) আহত হন। তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন, যে জাতি তাদের নবীকে আহত করে সে জাতি কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করবে?" তখন অবতীর্ণ হয়-

﴿ لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ ﴾

অর্থঃ "(হে নবী!) এ ব্যাপারে আপনার কোন ইখতিয়ার নেই।" (সূরা আলে-ইমরানঃ ১২৮)

এ বিষয়ে ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, তিনি ফজরের নামাযের শেষ রাকাতের রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলতেনঃ

তায়ালাই স্বীয় ইখতিয়ারে জীবন দান করেন এবং তাদের বিনা ইখতিয়ারেই তিনি জীবন বের করেন। সুতরাং মাখলুক হলো নিরুপায় ও বাধ্য। তাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকারী একমাত্র আল্লাহ। বাতিল উপাস্যরা নয়। একমাত্র তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যুদান করেন। আর এ কথা স্বভাবজাত চরিত্র থেকেই প্রত্যেকে স্বীকার করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার এটিও দলীল যে, তিনি উত্তম নাম ও উচ্চ গুণাবলী সম্পন্ন। তাঁর স্বত্ত্বা পরিপূর্ণ, মহান গুণাবলীর অধিকারী। সর্বময় পরিপূর্ণতা তাঁরই তাঁর নাম ও গুণালীতে কোন অসম্পূর্ণতা নেই।

১। আয়াতের মূলে قطمير শব্দ এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে বীজের আবরণ। যারা বীজের আবরণেরই মালিক নয় তারা কিভাবে তার চেয়েও বেশি বড় জিনিসের মালিক হবে? অতএব, তাদের নিকট দু'আ করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। এতে ফেরেশ্‌তা, নবী, রাসূল, সৎব্যক্তি, অসৎ ব্যক্তি জিন সবাই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তাদের উচিত সবাইকে ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকেই আহ্বান করা।

"হে আল্লাহ্ অমুক অমুককে অভিসম্পাত কর।" তিনি এটি "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ পড়ার পর বলতেন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেনঃ

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

অপর একটি বর্ণনায় আছে তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ বিন সুহাইল বিন আমর ও হারিছ বিন হেশামের জন্য বদদু'আ করতেন তখন অবতীর্ণ হয়ঃ

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

অর্থঃ "এ কার্যে তোমার কোনই সম্বন্ধ নেই।"[২] (সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১২৮)

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) এর প্রতি– ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি উঠে দাঁড়ায়ে বললেনঃ

يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَّالِي مَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»(صحيح البخاري، الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأرقاب، ح:٢٧٥٣ ومسند أحمد:٢/ ٣٦٠)

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়, অথবা এমন ধরনের কোন শব্দ, তোমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও, আল্লাহ্র দরবারে আমি তোমাদের কোন

২। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র একচ্ছত্র ক্ষমতার কোন অংশ মহানবীকে দেয়া হয়নি। তাঁরই যখন এ ক্ষমতা নেই তখন ফেরেশ্তা নবী, ওলী ও নেক্কার লোকেরা কিভাবে এ ক্ষমতা লাভ করবে? অতএব, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে ধাবিত হওয়ার সমস্ত পথ ভ্রান্ত এবং এটিও জরুরী যে, ইবাদত ও ইবাদতের সমস্ত প্রকার যেমনঃ দোয়া-প্রার্থনা, ফরিয়াদ, আশ্রয় প্রার্থনা, জবাই, নযর মানা ইত্যাদি সব কিছু একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করতে হবে। তিনি ব্যতীত আর কাউকে নয়।

উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সাফিয়াহ, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মাদ কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও, আমি আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[৩]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা আ'রাফ এবং সূরা ফাতিরের তাফসীর।

২। ওহুদের ঘটনা।

৩। মহানবীর কুনূত এবং নামাযে তাঁর পেছনে ওলীকূলের (সাহাবায়ে কেরামের) "আমান" বলা।

৪। যাদের জন্যে বদদু'আ করা হয়েছে তারা কাফের।

৫। তারা এমন কাজ করেছে যা অধিকাংশ কাফের করে না। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে, তাদের নবীকে আহত করা, তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া, নিজ বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃত করা।

৬। আল্লাহ এ বিষয়ে অবতীর্ণ করেনঃ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

৭। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করেন এবং তারা ঈমান আনে। আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾

৮। বিপদকালীন কুনূত পড়া।

৩। তিনি তাদের কোন উপকার করতে পারবেন না। অর্থাৎ শাস্তি নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। এই হাদীস স্পষ্ট দলীল যে, নবী (ﷺ) স্বীয় আত্মীয়দেরকে কোন উপকার সাধন করতে পারেননি, তবে তিনি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত তাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছিয়েছেন এবং এ মহা আমানত (রিসালাত) আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে আযাব-গজব থেকে পরিত্রাণ দেয়ার ক্ষেত্রে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ স্বীয় মাখলুকের মধ্যে কাউকে স্বীয় বাদশাহীর কোন কিছু অর্পণ করেননি বরং তিনি তার রাজত্ব ও ক্ষমতায় একক।

৯। নামাযে যাদের জন্য বদ্‌দু'আ করা হয় তাদের নাম ও তাদের বাপ-দাদার নাম উচ্চারণ করা।

১০। কুনূতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া।

১১। ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁর পরবর্তী ঘটনা।

১২। আল্লাহ্‌র রাসূল এমন গুরুত্বের সাথে একাজটি করেছেন যে শেষ পর্যন্ত তাকে পাগল পর্যন্ত বলা হয়েছে। কোন মুসলিম যদি আজও সে ধরনের দাওয়াতী কাজ করে সেও উক্ত অবস্থার শিকার হবে।

১৩। রাসূল (ﷺ) তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র নিকট আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না।" এমনকি তিনি ফাতেমাকে ও কেন্দ্র করে বলেছেন হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমি আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।"

তিনি সমস্ত নবীগণের সরদার হওয়া সত্বেও জগতের নারী-শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না। অতঃপর সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে *রক্ষার ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে* দৃষ্টিপাত করে তাহলে তার কাছে তাওহীদের শিক্ষা এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা জানতে পারবে।

অধ্যায়-১৫
ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার ওহী অবতরণের ভীতি

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ﴾

অর্থঃ "যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান।"* (সূরা সাবাঃ ২৩)

আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। মহানবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ আকাশে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে ফেরেশ্তারা তাঁর কথার প্রতি অনুগত হয়ে ডানা ঝাপটায়। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে।

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ﴾

---

* فزع অর্থাৎ ফেরেশ্তাদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর করা। ফেরেশ্তাদের আল্লাহ সম্পর্কে বহু জ্ঞান রয়েছে। তারা জানে যে, আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী, মর্যাদাবান এবং সমস্ত জগতের অধিপতি। এজন্য তারা আল্লাহ তায়ালাকে অত্যন্ত ভয় পায়। কেননা তারা আল্লাহ তায়ালা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কতিপয় গুণাবলী হলোঃ মহত্বপূর্ণ আর কতিপয় হলো, সৌন্দর্যপূর্ণ। যেসব গুণাবলী অন্তরে ভয়-ভীতি, অস্থিরতা ও রবের প্রতি আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাকে জালালী বা মহত্বপূর্ণ গুণাবলী বলা হয়। আর প্রকৃতপক্ষে এ জালালী গুণাবলীতে যিনি গুণান্বিত তিনিই হলেন আল্লাহ। কেননা তিনিই তাঁর পূত-পবিত্র গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। আর বাস্তবে যদি তাই হয় তবে গুণাবলীতে পরিপূর্ণ স্বত্ত্বায় হলো ইবাদতের উপযুক্ত। পক্ষান্তরে সৃষ্ট মানুষ হলো অসম্পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। নিশ্চয়ই তাদের জীবন পরিপূর্ণ নয়, কেননা কখানো সে মাখলুক এমন ঘটনার সম্মুখীন হয় যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আবার কখানো এমন অবস্থার স্বীকার হয় যে রুগ্ন-অসুস্থ হয়ে যায়। সুতরাং তারা অত্যন্ত দুর্বল ও মুখাপেক্ষী। তাদের কোন পরিপূর্ণ গুণাবলী নেই। তাই এটিই হলো তাদের অসম্পূর্ণ ও অপারগতার দলীল এবং তারা যে প্রতিপালিত ও বাধ্য তার দলীল। সুতরাং বান্দার উচিত হলো যার রয়েছে পরিপূর্ণ গুণাবলী, মহত্ব ও সৌন্দর্য তাঁরই দিকে ধাবিত হওয়া, আর তিনি হলেন একক-অদ্বিতীয় আল্লাহ। এটিই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যা প্রকাশ্য আল-হামদুলিল্লাহ।

অর্থঃ "যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান।" (সূরা সাবাঃ ২৩)

কথাটি একজন চুপিসারে শোনে তার নিকট থেকে আরেকজন চুপিসারে শোনে। এবার যে শোনে সে অপর জনের নিকট ওটি পৌঁছিয়ে দেয়। সুফইয়ান তার হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বর্ণনা করেন। এমনকি ওটি যাদুকর অথবা জ্যোতিষির নিকট চালান দেয়। হয়তো চালান দেয়ার আগেই তাকে অগ্নিস্ফুলিত পেয়ে বসে, হয়তো বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাকে ধরে ফেলার পূর্বেই শয়তান তাকে সে কথা বলে দেয় অতপর জ্যোতিষি শয়তানের পক্ষ থেকে শ্রবণকৃত কথার সাথে শতটি মিথ্যা বলে। তারপর বলা হয়, অমুক দিন কি আমাকে অমুক অমুক কথা বলা হয়নি। তখন সেই আকাশ থেকে শোনা কথাটি বিশ্বাস করা হয়।

নাওয়াস বিন সামআন (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّـمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّـهُ سِلْسِـلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ، ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْـتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْـتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَـفِّـهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَـدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَيَسْـمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِـرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَـيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَـذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ»(صحيح البخارى، التفسير، باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ح: ٤٨٠٠)

“আল্লাহ্ তা’আলা কোন বিষয়ে ওহী করতে চাইলে, উহার বিষয়টি উচ্চারণ করেন। আকাশসমূহ তখন কেঁপে উঠে অথবা আকাশে অবস্থিত সৃষ্টজীব ওটি শুনে মূর্ছা যায়। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সেজদায় পড়ে যায় বিকট আওয়াজ করে আল্লাহ্‌র ভয়ে। সর্বপ্রথম জিবরিল মাথা উপরে উঠান তখন আল্লাহ্ তার নিকট যা চান ওহী করেন। এরপর সে ফেরেশ্‌তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। সে যখনই কোন আকাশ অতিক্রম করে তখনই ফেরেশ্‌তারা তাকে প্রশ্ন করে হে জিবরাঈল, আমাদের প্রভু কি বললেন? তখন সে বলে, তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি উচ্চ মহান। তখন তারা সবাই জিবরাঈলের অনুরূপ কথা বলে। আর জিবরাঈল আল্লাহ্‌র নির্দেশিত স্থানে ওহীর কাজ সম্পন্ন করেন।”

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা সাবার ২৩নং আয়াতের তাফসীর।

২। এতে রয়েছে শিরক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষত নেক্‌কারদের সাথে সম্পর্কিত শিরকের প্রতিবাদ। এটিই সেই আয়াত যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের শিকড় কর্তনকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩। আয়াতটির তাফসীর। ﴿قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ﴾

৪। বিষয়টি সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের প্রশ্নের কারণ।

৫। জিবরাঈল ফেরেশ্‌তাদের উত্তরে বলেন, তিনি এরূপ বলেছেন।

৬। সমস্ত ফেরেশ্‌তা বেহুশ হওয়ার পর জিবরাঈল প্রথম মাথা তোলে-এর বর্ণনা।

৭। আকাশ সমূহের সকলকে সে একথা বলে। কারণ, তারা প্রশ্ন করে।

৮। আকাশ সমূহের সকলেই মূর্ছা যায়।

৯। আল্লাহ্‌র কথায় আকাশসমূহের কেঁপে ওঠা।

১০। জিবরাঈল আল্লাহ্‌র নির্দেশিত স্থানে অহী নিয়ে যায়।

১১। শয়তানের চুপিসারে শোনার বর্ণনা।

১২। তাদের একে অপরের উপর উঠার বর্ণনা।

১৩। শয়তানের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ।

১৪। কখনো কথা চালান দেয়ার পূর্বেই অগ্নিগোলক গিয়ে শয়তানকে জ্বালিয়ে দেয়, কখনো হানার পূর্বেই কথা অন্যের নিকট চালান দিয়ে দেয়।

১৫। জ্যোতিষরা কখনো কখনো সত্য কথা বলে।

১৬। তারা মূল কথার সাথে শতটি মিথ্যা কথা বলে।

১৭। আকাশ থেকে শোনা কথা দিয়েই কেবল তার মিথ্যা কথা বিশ্বাস করা হয়।

১৮। মানুষের অন্তর বাতিলকে গ্রহণ করে থাকে। তারা কিভাবে একশতটি মিথ্যার দিকে লক্ষ্য না করে একটি সত্যকে গ্রহণ করে।

১৯। তারা কথাটি একে অপরের নিকট থেকে গ্রহণ করে। ওটি মুখস্থ করে এবং ওটি দিয়েই প্রমাণ দেয়।

২০। আল্লাহ্র গুণাবলী সাব্যস্ত করা। যা আশআরিয়া ও মুআত্তালার বিপরীত।

২১। প্রকম্পিত হওয়া ও মূর্ছা যাওয়ার কারণ হল আল্লাহ্র ভয়।

২২। তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাজদায় অবনত হয়।

অধ্যায়-১৬
শাফায়াত (সুপারিশ)*

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾

---

* বিগত দুটি অধ্যায়ের পর এ অধ্যায়ের অবতারণা ন্যায় সঙ্গত হয়েছে। কেননা যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁর নিকট ফরিয়াদ করে অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন নবী বা ওলীদের নিকট প্রার্থনা করে, যখন তাদের সামনে তাওহীদে রুবুবিয়াতের (আল্লাহর প্রভুত্বের একত্ব) প্রমাণ পেশ করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা তো তা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা হলো আল্লাহর নিকটতম সম্মানিত বান্দা এবং আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তাকে তারা সুপারিশের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করবে। কেননা আল্লাহর নিকট রয়েছে তাদের মর্যাদা, আর তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের আল্লাহ মর্যাদা উঁচু করেছেন। যার ফলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। এই হলো তাদের ভ্রান্ত ধারণা। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব মুশরিকদের অবস্থা ও তাদের প্রমাণাদি সামনে রেখে বলেনঃ যখন তাদের সাথে এসব ক্ষেত্রে তর্ক করা হয়, তাদের নিকট শুধু সুপারিশ করার দলীল ব্যতীত আর কোন দলীল নেই। যার ফলে এ পর্যায়ে শাফায়াতের অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে। শাফায়াত বা সুপারিশের অর্থ হল দু'আ। কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের মাধ্যমে সুপারিশ বা শায়ায়াত কামনা করি, তার অর্থ হচ্ছে, আমি রাসূলের নিকট আবেদন করি তিনি যেন আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন আর এটি হলো দোয়া-প্রার্থনা। কুরআন ও সুন্নাতের অন্যান্য দলীল দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দোয়া-প্রার্থনা বাতিল সাব্যস্ত হয়। ঐ সমস্ত দলীল দ্বারা মৃত ব্যক্তি এবং যারা ইহকাল থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের থেকে সুপারিশ প্রার্থনা করাও বাতিল সাব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত-সুপারিশ চাওয়া মহা শিরক। তবে জীবিত ব্যক্তির নিকট চাওয়া জায়েয, কেননা তারা তো ইহকালে অবস্থান করছেন এবং উত্তর দেয়ার সামর্থ রাখেন। আল্লাহ তায়ালা জীবিত ব্যক্তি থেকে দোয়া করানো সুপারিশ কামনা করার অনুমতি দিয়েছেন। যার ফলে নবী (ﷺ) এ জীবদ্দশায় কখানো কখনো সাহাবীগণ আসতেন এবং তাদের জন্য দোয়ার আবেদন করতেন। আমাদের জানা উচিত সব সুপারিশ ও দোয়অ কবুল হবে এমন নয় বরং কোন সুপারিশ গ্রহণ হবে আবার কোনটি প্রত্যাখ্যান ও হতে পারে। সুপারিশ গ্রহণ হওয়ারও কতিপয় শর্ত রয়েছে অনুরূপ প্রত্যাখ্যান হওয়ারও কিছু কারণ রয়েছে।

অতএব আমরা বুঝতে পারি যে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সুপারিশ দুই প্রকারঃ (১) নিষিদ্ধ সুপারিশ (২) অনুমোদিত সুপারিশ। নিষিদ্ধ সুপারিশ হলোঃ যে সুপারিশ আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের জন্য নিষেধ করেছেন। যেমনঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার প্রথম দলীল সূরা আনয়ামের ৫১নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন:

অর্থঃ "(কোরআন) এর মাধ্যমে তুমি ঐ সকল লোককে ভয় দেখাও যারা নিজেদের প্রভুর নিকট একত্র হওয়ার ভয়ে ভীত। তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই, সুপারিশকারীও নেই।"[১] (সূরা আন'আম ঃ ৫১)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾

অর্থঃ "বল, সকল সুপারিশ কেবল আল্লাহ্‌রই।"[২] (সূরা যুমারঃ ৪৪)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾

অর্থঃ "কে আছে যে তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" (সূরা বাকারাহঃ ২৫৫)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ

১। তাওহীদ পন্থী ব্যতীত সকলের জন্য এই শাফায়াত নিষিদ্ধ। আবার তাওহীদপন্থীদের সুপারিশ বা শাফায়াত ও কবুল হবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে। আর তা হলোঃ (১) সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি। (২) সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে, উভয়ের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সুপারিশের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত কারো নয়। এজন্য লেখক (রহঃ) এরপর দ্বিতীয় আয়াতঃ ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ (অর্থঃ বলুনঃ সব ধরনের সুপারিশ আল্লাহরই অধিকারে) নিয়ে এসেছেন।

২। সকল প্রকার সুপারিশ কেবল আল্লাহ্‌র অধিকারে। প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের ও যারা মুমিন নয় তাদের আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশের অধিকার নেই। বরং সুপারিশ আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই হবে। যেহেতু কোন সুপারিশ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষেই উপকারে আসবে না এই লেখক (রহঃ) তারপর দুটি আয়াত নিয়ে আসেনঃ প্রথম আয়াতঃ

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾

অর্থঃ "কে আছে যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" (সূরা বাকারাহঃ ২৫৫)

দ্বিতীয় আয়াতঃ

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ﴾

অর্থঃ "আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।" (সূরা নাজমঃ ২৬)

﴿ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾

অর্থঃ "আর আকাশে কত ফেরেশতা আছে তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না তবে আল্লাহ্ যাকে চান ও পছন্দ করেন তাকে অনুমতি দেয়ার পর!"[৩] (সূরা নাজমঃ ২৬)

আল্লাহ্র বাণী–

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾

অর্থঃ "বল, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের সংকল্প করতে তাদের ডাক। তারা আকাশ ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণও কোন কিছুর মালিক নয়।"[৪]

৩। আয়াতদ্বয় আনার উদ্দেশ্য হলোঃ প্রথম আয়াত দ্বারা অনুমতির শর্তারোপ করা। অর্থাৎ ফেরেশ্তা, নবী বা নৈকট্য অর্জনকারী যে কোন ব্যক্তি হোন না কেন আল্লাহর অনুমতি (শর্ত) ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবেন না। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সুপারিশের মালিক এবং তিনিই একমাত্র সুপারিশের তৌফিক দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য সুপারিশকারীর কথার উপর এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি সন্তুষ্টি থাকতে হবে। উল্লেখিত শর্তসমূহের উপকারিতা যে সমস্ত মাখলুকের নিকট (অজ্ঞতাবশতঃ) সুপারিশ কামনা করা হয়, তাদের সাথে সুপারিশের জন্য সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের ক্ষেত্রে এ ধারণা না রাখা যে আল্লাহর নিকট তাদের এমন মর্যাদা রয়েছে যার দ্বারা তারা সুপারিশ করার অধিকার রাখে। মুশরিকগণ এ ধরনেরই বিশ্বাস করে যে, তাদের বাতিল মা'বূদগুলি অবশ্যই সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ তাদের সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

উল্লিখিত আয়াতগুলি দ্বারা ঐ সমস্ত মুশরিকের দাবীর অসারতা প্রমাণিত যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি কেউ সুপারিশ করতে পারে। যখন একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ সুপারিশের মালিক নয়। আর যে ব্যক্তি সুপারিশ করবে সে আল্লাহর অনুমতিতেই করতে পারবে। অতএব মাখলুকের সাথে তার সুপারিশ পাওয়ার জন্য তারা কিভাবে সম্পর্ক গড়তে চায়? পক্ষান্তরে সম্পর্কতো শুধু তাঁরই সাথে হওয়া উচিত যে সুপারিশের প্রকৃত মালিক।

কিয়ামতের দিন নবী (ﷺ) নিঃসন্দেহে সুপারিশ করবেন ; কিন্তু ঐ সুপারিশ আমরা কার নিকট চাইব? তা একমাত্র আল্লাহরই নিকট চাইব। এবং এভাবে বলবঃ اللهم شفع فينا نبيك "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার নবীর সুপারিশ নসীব করুন। কেননা আল্লাহ তায়ালাই নবী (ﷺ) কে সুপারিশের তৌফিক দিবেন ও অন্তরে ইলহাম করে দিবেন যে, অমুক অমুকের জন্য সুপারিশ করুন এটি তাদের জন্য যারা এই সুপারিশের জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকট দোয়া করেছে যে নবী (ﷺ) যেন তাদের জন্য সুপারিশ করেন। এই জন্যই শায়খ (রহঃ) তারপর সূরা সাবার ২২-২৩ নং আয়াত বর্ণনা করেন।

(সূরা সাবাঃ ২২-২৩)

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেনঃ,[5] যা কিছুর সাথে মুশরিকদের সম্পর্ক আছে তার সবগুলোকেই আল্লাহ্ অস্বীকার করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য

৪। এখানে তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ (১) যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে তাদের দেখুক তারা কি আকাশে ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণ ও কোন কিছুর মালিক? আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾

অর্থঃ "যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে, তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়।" অতএব তাদের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বলতে কোন কিছু নেই।
(২) আল্লাহ্র কোন বিষয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই। অর্থাৎ আল্লাহর তাদের মধ্য থেকে কেউ মন্ত্রী ও নয় এবং সাহায্যকারীও নয়। (৩) শাফায়াতের অধিকার কারোর নেই তবে যে অনুমতি লাভ করবে সেই শাফায়াতের অধিকার পাবে। এক্ষেত্রে তাদের ভ্রান্ত আকীদাকে সূরা সাবার ২৩নং আয়াতের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ১- কাকে এই অনুমতি দেয়া হবে? ২- শাফায়াতকারী হিসেবে আল্লাহ্ কার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন? ৩- কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন? উক্ত তিনটি প্রশ্নে উত্তর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার উক্তিতে বিদ্যমান।

৫। قال أبو العباس: نفى الله عما سواه..........نفاها القــرآن কিয়ামতের দিন উল্লিখিত শর্ত ব্যতীত সুপারিশ স্বীকৃত হবে না। মুশরিকদের বিশ্বাস যে, নিশ্চয়ই শাফায়াত সুপারিশ আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীতই অর্জন হবে। কেননা তাদের নিকট সুপারিশকারীই হলো সুপারিশের অধিকারী ; কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুপারিশ শর্তসাপেক্ষে অর্জন হওয়াই সাব্যস্ত।
এ হলো শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রয়োজনের দলীল। নবী (ﷺ) ও অন্যদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ; কিন্তু তাঁরা নিজেরাই শাফায়াত অনুমতি ব্যতীত শুরু করবেন না বরং তাঁরা প্রথমতঃ অনুমতি চাইবেন, তারপর তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। কেননা তাঁরা তো শাফায়াতের মালিক নন। তার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।
সুতরাং যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন তার জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশ করা হবে। আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলো ইখলাসধারী ও তাওহীদ পন্থী ব্যক্তি। অতএব উক্ত সুপারিশ মুশরিকদের ভাগ্যে জুটবে না। এই জন্য তিনি বলেনঃ ব্যাপার যদি এরূপই হয় তবে যারা মৃত ব্যক্তি, রাসূল, নবী, সৎ ব্যক্তি ওলী বা অসৎ ব্যক্তিদের প্রতি যারা ধাবিত হয় এবং তাদের নিকট শাফায়াত চায় তারা নিশ্চয়ই মুশরিক। কেননা তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট শাফায়াত চাওয়ার মাধ্যমে দোয়া প্রার্থনায় ধাবিত হয়েছে। অথচ তারা শাফায়াতের মালিক নয়। বরং তারা নিশ্চয়ই শাফায়াত করবেন অনুমতি ও সন্তুষ্টির পর আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হবে তাওহীদপন্থীদের জন্য। আর তাওহীদপন্থী হলো যারা কোন মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত চায় না। অতএব যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত চাইল সে নিজেকে নবী (ﷺ) এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করল। কেননা সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করল।

শাফায়াতের হাকীকত, অর্থাৎ শাফায়াত অর্জনের তাৎপর্য কি? এবং কিভাবে শাফায়াত অর্জন হবে?

উত্তর হলোঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যেঃ আল্লাহ্ তায়ালা শাফায়াতের মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদেরকে ক্ষমা করবেন। সেটি হবে শাফায়াতকারীর ফযীলত ও তার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য। আর এটিই হলো শাফায়াতের হাকীকত, আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করলেন ও তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে শাফায়াত করানোর মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং যার জন্য শাফায়াত করা হলো তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করলেন শাফায়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে।

অতএব বিষয়টি অবশ্যই সম্পূর্ণই ফুটে উঠে যার রয়েছে আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্ব ও তাঁর একক কর্তৃত্বের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি। আর তা হলো, শাফায়াতের আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। হুকুম ও বাদশাহী সম্পূর্ণ তাঁরই। সুতরাং ব্যাপার যেহেতু এরূপই তাহলে শাফায়াতের প্রত্যাশার জন্য একমাত্র তাঁরই সাথে অন্তরের সম্পর্ক গড়া ওয়াজিব। কুরআন মাজীদে ঐ শাফায়াতেরই নাকচ করা হয়েছে যার মধ্যে শিরক রয়েছে যেমনঃ আল্লাহ্ তায়ালার বাণীঃ

﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

অর্থঃ "যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী হবে, না থাকবে কোন সুপারিশকারী।" (সূরা আনআম-৫১)

এ ধরনের বাণীর মধ্যে যে সমস্ত শাফায়াতে শিরক রয়েছে তার নাকচ হয়েছে। অনুরূপ মুশরিকদের জন্যেও শাফায়াত করাও নিষেধ। কেননা আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হননি। অতএব যখন এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে তিনিই শাফায়াত বাস্তবায়নকারী, তিনিই নিয়ামত দানকারী, তিনিই তাঁর মহত্ব প্রকাশের সমর্থ দেন এবং অন্তর একমাত্র তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত করার তৌফিক দিবেন। তারই সাথে শাফায়াত সুসাব্যস্ত। সুতরাং প্রত্যেক মহা শিরকে পতিত ব্যক্তি থেকে শাফায়াত নাকচ হয়ে যায়। কেননা শাফায়াত হলো ইখলাস-তাওহীদ পন্থীদের জন্য যা আল্লাহর একটি অনুগ্রহ।

আর এই হলো স্বীকৃত শাফায়াত অর্থাৎ যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুসাব্যস্ত। অনুমতি দুই প্রকারঃ (১) অবস্থাগত অনুমতি (২) শরীয়ত সম্মত অনুমতি।

অবস্থাগত অনুমতির অর্থ হলোঃ যে ব্যক্তি শাফায়াতের অনুমতিপ্রাপ্ত সে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পূর্বে কখনোও শাফায়াত করতে পারবেনা। অতএব আল্লাহ যদি তাকে বাধা দিয়ে থাকেন তবে তার দ্বারা শাফায়াত সম্ভব হবেনা এমনকি সে মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবে না।

শরীয়ত সম্মত অনুমতির অর্থ হলোঃ শাফায়াতে শিরক অন্তর্ভুক্ত যেন না হয় এবং যার জন্য শাফায়াত করা হবে সে যেন মুশরিক না হয়। অবশ্য নবী (ﷺ) এর চাচা আবু তালেব এ বিধানের আওতামুক্ত। কেননা তার ক্ষেত্রে নবী (ﷺ) তার আযাব হালকা হওয়ার জন্য শাফায়াত করবেন। কিন্তু শাফায়াত তাকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য কোন উপকারে আসবে না বরং তা হবে শুধু আযাব হালকা করার জন্য। আর এ ব্যাপারটি নিতান্তই নবী (ﷺ) এর জন্য কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁকে অহী করেন ও এর অনুমতি দেন।

কারোর মালিকানা ও অংশীদারিত্বকে তিনি অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ্‌র কোন সহযোগী থাকাকেও অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি দেন তার সুপারিশ ব্যতীত আর কারোর সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না।

আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ্‌ যার প্রতি সন্তুষ্ট সে ছাড়া আর কারোর জন্য তারা সুপারিশ করতে পারবে না।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ২৮)

মুশরিকরা যে সুপারিশের ধারনা করে তা কিয়ামতের দিন থাকবে না যেমন কোরআন তা অস্বীকার করেছে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, তিনি এসে তার প্রভুর উদ্দেশ্যে সাজদা করবেন, তাঁর প্রশংসা করবেন। তিনি প্রথমেই সুপারিশ করতে আরম্ভ করবেন না। এরপর তাঁকে বলা হবে, মাথা তোল বল তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আবূ হুরায়রা তাকে বলেন, আপনার সুপারিশ লাভের সবচেয়ে হকদার ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিখাদ মনে বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। এই সুপারিশ লাভ করবে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে খালেস নিয়তের লোকেরা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে তার জন্য এটি হবে না। মূল কথা হল, আল্লাহ্‌ নিখাদচিত্তের অধিকারীদের উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন তার দু'আর মাধ্যমে তাদের ক্ষমা করবেন। এর মাধ্যমে তিনি সুপারিশকারীকে সম্মানিত করবেন এবং তিনি প্রশংসিত স্থান লাভ করবেন। যে সুপারিশ শিরকযুক্ত সেটিকে পবিত্র কুরআন অস্বীকার করেছে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, তাওহীদ ও ইখলাসবাদী ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ লাভ করতে পারবে না।[৬]

৬। শাফায়াতের এ অধ্যায়ের মাধ্যমে ফুটে উঠে যে, বিদআতী, কুসংস্কারবাদী ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্ককারীরা যে, শাফায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখে তা নিশ্চয়ই বাতিল শাফায়াত। আর তাদের বক্তব্যঃ

﴿ وهؤلاء شفعاءنا عند الله ﴾

অর্থঃ "ঐ সমস্ত ব্যক্তিত্ব আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।" বাতিল ও ভ্রান্ত বক্তব্য। কেননা যে শাফায়াত কার্যকরী তা শুধু তাওহীদপন্থী ইখলাস বাদীদের জন্যই। যেহেতু

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আয়াতসমূহের তাফসীর।

২। নিষিদ্ধ সুপারিশের বিবরণ।

৩। শরীয়ত অনুমোদিত সুপারিশের বর্ণনা।

৪। বড় সুপারিশের উল্লেখ। যাকে প্রশংসিত স্থান বলা হয়।

৫। মহানবী (ﷺ) প্রথমেই সুপারিশ করতে উদ্যত হবেন না; বরং তিনি সাজদায় অবনত হবেন। অনুমতি পাওয়ার পর সুপারিশ করবেন।

৬। কে সুপারিশ লাভের হকদার বেশি? (সে হলো তাওহীদপন্থী)

৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করবে সে এই সুপারিশ লাভ করতে পারবে না।

৮। সুপারিশের স্বরূপ বর্ণনা।

তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের নিকট শাফায়াত তলব করে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করে। আর এটিই হলো তাদের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আলামত।

এই অধ্যায়ের ফল কথা হলোঃ উক্ত বিদআতী ও কুসংস্কারবাদীদের যে শাফায়াতের সাথে সম্পর্ক তা তাদের কোন উপকার করবে না বরং ক্ষতি করবে। কেননা তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট শাফায়াত কামনা করে প্রকৃত শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তারা এমন কিছুতে জড়িত হয়েছে আল্লাহ যার কোন অনুমোদন দেননি। কেননা তারা শিরকী শাফায়াত ব্যবহার করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের শরণাপন্ন হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়েছে।

অধ্যায়-১৭
হিদায়াত দানকারী একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভাল বেসেছেন তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না।"* (সূরা কাসাসঃ ৫৬)

---

* হেদায়েত দুই প্রকারঃ প্রথমঃ হেদায়েতে তাওফীক ও ইলহাম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কর্তৃক বান্দাকে হেদায়েত কবুলের জন্য বিশেষ সাহায্য করা। আর তার উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার অন্তরে হিদায়াত গ্রহণের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। যা অন্যের অন্তরে দেননি। অতএব তৌফিক হলো, বিশেষ সাহায্য লাভ, আল্লাহ যার জন্য পছন্দ করেন তাকে তার তৌফিক দান করলে সে হিদায়াত গ্রহণ করে থাকে এবং এর মধ্যে সে প্রচেষ্টা করে থাকে। সুতরাং তা অন্তরে দেয়া হয় নবীর (ﷺ) হাতে নয়। অতএব অন্তর হলো আল্লাহর হাতে তিনি যেভাবে পছন্দ করেন সেভাবে পরিবর্তন করে থাকেন। এমন কি নবী (ﷺ) যাকে পছন্দ করে ছিলেন তাকে মুসলমান করতে ও হিদায়াত দান করতে পারেননি। যিনি তাঁকে আত্মীয়দের মাঝে সর্বাধিক উপকার সাধন করেছিলেন তিনি হলেন আবু তালেব। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে হিদায়াতে তৌফিক দান করতে পারেননি।

হিদায়াতের দ্বিতীয় প্রকারঃ এর সম্পর্ক মানুষের সাথে। এ হলো ইরশাদ ও নির্দেশ সূচক হিদায়াত এ হিদায়াত নবী (ﷺ)এর জন্য ও আল্লাহর পথে প্রত্যেক আহ্বানকারী ও প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্য সাব্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾

অর্থঃ "আপনি তো শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্য কেউ না কেউ হিদায়াতকারী অবশ্যই হয়ে থাকে।" (সূরা রা'দ, আয়াতঃ ৭) তিনি নবী (ﷺ) কে আরো বলেনঃ

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই মানুষদেরকে আপনি সরল পথের দিকে নির্দেশনা দেন।" (সূরা শুরাঃ ৫২) অর্থাৎ আপনি সর্বোত্তম দলীল ও সর্বোত্তম নির্দেশিকা দ্বারা লোকদেরকে সরল পথের দিকে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন। যা মো'যেযা এবং শক্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা মদদপুষ্ট এবং যা আপনার সততার ও প্রমাণ বহনকারী।

যখন হিদায়েতে তৌফিক মুহাম্মাদ (ﷺ) এর এত মহত্ব, শান ও তাঁর রবের নিকট এত মর্যাদা সত্ত্বেও নাকচ হয়ে যায়। অতএব বড় বড় উদ্দেশ্য যেমন হিদায়াত, ক্ষমা প্রদর্শন, সন্তুষ্টি কামনা, খারাপী থেকে দূরত্ব কামনা ও যাবতীয় কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখা বাতিল পর্যবসিত হয়।

ইবনুল মুসাইয়্যেব হতে সহীহ হাদীসে রয়েছে। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবূ তালিবের মৃত্যু আসন্ন হলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তার নিকট এলেন। তার নিকট ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়াহ ও আবূ জাহল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, হে চাচা! বলুন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" এমন একটি কথা যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য ঝগড়া করবো। তখন তারা উভয়ে তাকে (আবু তালিব কে) বলল, তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হবে? মহানবী (ﷺ) তাকে কথাটি আবার বললেন। তারাও তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করল সে সবশেষে বলল, আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মে আছি এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে অস্বীকার করল। মহানবী (ﷺ) বললেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেনঃ

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ ﴾

অর্থঃ "নবী ও ঈমানদারদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।" (সূরা তাওবাঃ ১১৩)

আর আবূ তালিব সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করেনঃ

﴿ إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালবেসেছেন তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।"[১] (সূরা কাসাসঃ ৫৬)

১। وفي الصحيح عن ابن المسيب ...... لأستغفرن لك ما لم أنه عنك

لأستغفرن শব্দের মধ্যে لام শপথের জন্য ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া করব। আর নবী (ﷺ) প্রকৃত পক্ষেই স্বীয় চাচার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করেছেন। কিন্তু নবী (ﷺ) এর এ দোয়া কি তাঁর চাচার কোন উপকারে এসেছিল? কোনই উপকারে আসেনি কেননা এখানে যার জন্য শাফায়াত করা হয়েছিল সে মুশরিক ছিল। আর ক্ষমা প্রার্থনা ও শাফায়াত মুশরিকদের জন্য উপকারে আসবে না। নবী (ﷺ) এর এ অধিকার নেই যে কোন মুশরিকের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাকে কোন উপকার সাধন করে দিবেন বা কোন ব্যক্তি শিরক করে তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে আর তিনি তার বিপদাপদ দূর করে কল্যাণ সাধন করে দিবেন। এজন্যই তিনি বলেনঃ আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বিরত

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ আয়াতটির তাফসীর।

২। ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ অংশটির তাফসীর।

৩। আপনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলুন রাসূল (ﷺ) এর এ কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবীদারদের বিপরীত। (যারা দাবী করে যে শুধু জানাই যথেষ্ট)

৪। আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা জানত মহানবী "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু দ্বারা কি বুঝিয়েছেন।" আল্লাহ তায়ালা তাদের খারাপী করুন, যাদের তুলনায় আবু জাহল ইসলামের মূলের ব্যাপারে বেশী জানত।

৫। চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মহানবীর তীব্র আগ্রহ ও প্রাণপণ চেষ্টা।

৬। যারা এই ধারণা করত যে আব্দুল মুত্তালিব ও তার পূর্ববর্তীরা মুসলমান তাদের প্রতিবাদ।

না করা হবে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। অতপর আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ﴾

অর্থঃ "নবী ও অন্যান্য মুমিনদের জন্যে জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরাঃ তাওবাঃ ১১৩)

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নবী (ﷺ) কে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। ব্যাপার যদি এরূপই হয় তবে যদি মনে করা হয়, নবী (ﷺ) আ'লমে বারযাখে ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করতে পারেন তবুও তিনি কোন এমন মুশরিকের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে পারেন না। যে আল্লাহ ব্যতীত তাঁর নিকট শাফায়াত তলব করে, ফরিয়াদ করে, জবাই করে, মানত করে, অথবা তাঁকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করে, তাঁর উপর ভরসা করে অথবা তাঁর নিকট স্বীয় প্রয়োজন তুলে ধরে শিরকে লিপ্ত হয়।
আল্লাহ তায়ালা আবু তালেবের ব্যাপারে অবতীর্ণ করেনঃ

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

অর্থঃ "তুমি যাকে ভালবাসা ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসরণকারীদেরকে।

৭। মহানবী তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হয়নি ; বরং নিষেধ করা হয়েছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

৮। মানুষের জীবনে অসৎ সঙ্গীদের কুপ্রভাব।

৯। পূর্ববর্তীদের সম্মানে বাড়াবাড়ি করার ক্ষতি।

১০। আবূ জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীদের অন্তরে সংশয়।

১১। সর্বশেষ আমলের উত্তম পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবূ তালিব যদি শেষ মুহূর্তে কালিমা পাঠ করত তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

১২। গোমরাহীতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্তার বিষয় নিহিত রয়েছে। কেননা উক্ত ঘটনায় ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভালবাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে সুস্পষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

অধ্যায়-১৮

বনী আদমের কুফরী এবং তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার কারণ নেক্‌কারদের বেলায় বাড়াবাড়ি করা সম্পর্কিত*

---

* শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) এই অধ্যায় ও এর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করেন যে, এ উম্মত ও পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝে শিরক অনুপ্রবেশের নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় কারণ হলো, সৎ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে الغلـو অর্থাৎ বাড়াবাড়ি সীমালংঘন করা, যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। মৌলিক নীতিমালা ও আকীদার বর্ণনার পর এক্ষেত্রে পথ-ভ্রষ্টতার কারণ বর্ণনা উদ্দেশ্য।

الغو ঃ غلو শব্দটি আরবী বাক্য غلا في الشيء কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা বুঝায় যখন বিষয়টিকে নিয়ে সীমালংঘন হয়ে যায়। অতএব বনী আদমের কুফরী ও তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার কারণ হলো, সৎ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদায় ঐ সীমা অতিক্রম করা যতটুকুর আল্লাহ্ তায়ালা অনুমতি দিয়েছেন।

সৎব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হলোঃ নবী, রাসূল, ওলী এবং প্রত্যেক ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সৎ ও ইখলাসের গুণে গুণান্বিত। তাঁরা হলো যাবতীয় নেক কাজে অগ্রগামী বা মধ্যপন্থী। আর তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট মর্যাদা। আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সৎলোকদেরকে ভালবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাঁদের সৎকর্ম ও ইলমের অনুসরণ করা হলো আমাদের করণীয়। সৎব্যক্তিগণ যদি নবী ও রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাঁদের শরীয়ত ও হুকুম আহকামের উপর চলতে হবে এবং তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। এটিই হলো তাঁদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত সীমা, এগুলিই হলো তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতা, তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদও তাঁদেরকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নমুনা হলো, তাঁদের কাউকে কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয়া বা কারো কারো ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, তিনি লাওহ ও কলমের ভেদ জানেন বা তিনিই ভূপতি। যেমনঃ বুসাইরী তার প্রসিদ্ধ কবিতায় আবৃত্ত করেনঃ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নবী (ﷺ) এক এমন কোন নিদর্শন দেয়া হয়নি যা তার মান-মর্যাদার সমতুল্য হতে পারে। এই কবিতার ব্যাখ্যাকারকগণ বলেনঃ নবী (ﷺ) কে যত নিদর্শনাবলী মোজেযা দেয়া হয়েছে এমন কি আল-কোরআনের ও মর্যাদা তাঁর সমতুল্য নয়। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) আরো বলা হয় তাঁর তো এত বড় স্থান ও মর্যাদা যে, তাঁর নাম নেয়ার ফলে মৃতদের মাটিতে মিশে যাওয়া হাড় একত্রিত হয়ে জীবিত হয়ে যায়। এ ধরনের বাড়াবাড়ি তারাই করে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পূজারী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে নবী ও রাসূলদের দিকে ধাবিত হয় ও তাদের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাসী অথচ যার কখনোও অনুমতি দেয়া হয়নি বরং তা হলো আল্লাহ তায়ালারি সাথে মহা শিরক স্থাপন এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের সাদৃশ্য জ্ঞাপন নাউযুবিল্লাহ। এ হলো আল্লাহর সাথে কুফরী। অতএব এখানে রয়েছে শরীয়ত অনুমোদিত সৎলোকদের

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾

অর্থঃ "হে গ্রন্থধারীরা, তোমরা তোমাদের দ্বীনে বাড়াবাড়ি করো না।"[1] (সূরা নিসাঃ ১৭১)

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে সহীহ হাদীসে রয়েছে। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا﴾

অর্থঃ "এবং বলেছিলঃ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে।"[2] (সূরা নূহ, আয়াতঃ ২৩)

সম্মানের সীমা-রেখা এবং অন্য দিকে রয়েছে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি। এক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থা হলোঃ অত্যাচার, কঠোরতা ও অবিচার, অর্থাৎ সৎলোকদের সাথে আন্তরিকতা, সম্মান ও তাঁদের হক আদায় না করে এবং তাঁদের ভাল না বেসে তাদের প্রতি অবিচার করা। সুতরাং তাঁদের অবজ্ঞা করা হলো অবিচার ও তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হলো সীমালঙ্ঘন।

১। ﴿يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবকে বাড়বাড়ি করা থেকে নিষেধ করেছেন। تغلوا ক্রিয়াটি في এরপর আসার কারণে দ্বীনের ভিতর সব ধরনের বাড়াবাড়ি নিষেধ। আল্লাহ্‌ তায়ালা আহলে কিতাবদের যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারা সৎব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করেছে। যেমনঃ খ্রিস্টানরা ঈসা (عليه السلام) কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তারা বাড়াবাড়ি করেছে তাঁর মাতা মারইয়াম ও তাঁর হাওয়ারীদেরকে নিয়ে। ইহুদীরাও বাড়াবাড়ি করেছে উযাইর (عليه السلام) মূসা (عليه السلام) এর সাথী ও তাদের পুরোহিত পাদরীদেরকে নিয়ে। তারা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যসমূহ সাব্যস্ত করে, তাদের নিকট শাফায়াত তলব করে, মনে করে যে বিশ্বজগতের আধিপত্যে তাদের অংশ রয়েছে। তাঁরা কার্যপরিচালনা করে যা বিশ্বজগত নিয়ন্ত্রণে তাদেরও কিছু কিছু কর্তৃত্ব রয়েছে।

২। وفى الصحيح عن ابن عباس .... فى قول الله تعالى ...ونسـرا... إلى قـومهم নূহের (عليه السلام) জাতিতে শিরকের অনুপ্রবেশ। নূহ (عليه السلام) এর জাতি যে শিরকে নিমজ্জিত ছিল তাহলো, সৎব্যক্তি ও তাঁদের রূহের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। শয়তান সে জাতির নিকট বুজুর্গ ব্যক্তির আকৃতিতে আগমন করে এবং তার বুজুর্গী ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দাবী করে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক গড়বে তার জন্য আমি শাফায়াত করব। অতএব শয়তান তাদেরকে সম্মানের এ পর্যায় থেকে নিয়ে যায় প্রতিকৃতি, মূর্তি, আস্তানাও দরগাহ পর্যন্ত। যেমন আলোচ্য অংশে ইবনে আব্বাস

এইগুলি (অর্থাৎ ওয়াদ্দু, সু'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর) নূহ্ জাতির নেক্কার লোকদের নাম। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের জাতিকে বলল, এরা যে সকল আসনে বসত সে সকল আসনে প্রতিকৃতি স্থাপন কর এবং এগুলিকে তাদের নামে নামকরণ কর। তখন তারা তাই করল। তবে এদের এগুলির ইবাদত করা হয়নি। এরপর এরা যখন মারা গেল এবং ইলম উঠে গেল তখন এই মূর্তিগুলির ইবাদত করা শুরু হল।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, একাধিক সালাফে সালেহীন বলেছেন, এই সকল লোক মারা যাওয়ার পর জীবিত লোকেরা তাদের কবরের পাশে অবস্থান করলো। তাদের মূর্তি তৈরি করলো। এরপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে তাদের ইবাদত শুরু করে দেয়।[3]

ইবনে ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّـمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»(صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ﴿واذكر في الكتب مريم﴾ ح:٣٤٤٥، وأصله عند مسلم في الصحيح، ح:١٦٩١)

(রাযিআল্লাহু আনহুমা) এই শিরক পতিত হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেনঃ "তারা যখন ধ্বংস হয়ে যায়, শয়তান তাদের জাতির অন্তরে ইলহাম করে দেয় যে, তারা যেখানে অবস্থান করতো সেখানে আস্তানা বা দরগাহ গড়ে তোল এবং তাদের নামে নামকরণ কর। অতপর তারা তাই করলো, তবে ইবাদত শুরু হলো না। অতপর যখন তারা মারা গেল, জ্ঞান ও উঠিয়ে নেয়া হলো। তাদের ইবাদত শুরু হয়ে গেল।"

৩। وقال ابن القيم: قال غير واحـــد.......فعبـــدوهم এ অংশের উদ্দেশ্য হলোঃ তারা যখন ঐ বুজুর্গ ব্যক্তিদের ছবি তৈরি করার ইচ্ছা করে তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা ঐ সমস্ত ছবির পূজা করবে না কেননা তারা জ্ঞানী ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটল তখন ঐ ছবিগুলির পূজা করা সৎলোক ও বুজুর্গদের নৈকট্য অর্জনের উসীলা ও কারণ মনে করতে লাগল। শয়তান কখনো কখনো উক্ত ছবি প্রতিকৃতির নিকট এসে তার দর্শকদের বা উপস্থিত ব্যক্তিদের মনে এ ধরনের প্রভাব ফেলতো যে এ প্রতিকৃতি তো কথা বলতে পারে এবং তার কথাও শ্রবণ করতে পারে ও এ ধরনের বহু ধারণা তাদেরকে দিয়ে থাকে। যার ফলে তাদের অন্তর সৎব্যক্তিদের রূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। পরিশেষে শয়তান তাদেরকে বুজুর্গদের পূজার প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে।

বর্তমানে এই অবস্থা হলো ঐ লোকদের যারা কবর-মাজারে গিয়ে নামাযের মত করে বসে ও আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের সাথে তাদেরও ইবাদত করে। আর আমলই আল্লাহর সাথে শিরক করা কারণ হয়ে দাড়ায়।

"তোমরা আমার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো একজন বান্দা বৈ আর কিছু নই। তাই তোমরা বল, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল।[4] (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ»(سنن النسائي، المناسك، باب التقاط الحصى، ح:٣٠٥٩ وسنن ابن ماجه، المناسك، باب قدر حصى الرمي، ح:٣٠٢٩)

"তোমরা বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাক। কারণ, এই বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে।"[5]

মুসলিম শরীফে ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ - قَالَهَا ثَلاَثًا»(صحيح مسلم، العلم، باب هلك المتنطعون، ح: ٢٦٧٠)

"সীমালংঘনকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।" তিনি কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন।[6]

৪। وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني........ابن مريم

الإطراء শব্দের অর্থ হলোঃ কারো প্রশংসায় সীমালংঘন করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় প্রশংসায় সীমালংঘন করতে এই জন্য নিষেধ করেন যে, খ্রিস্টানরা যখন ঈসা (عليه السلام) এর প্রশংসায় সীমালংঘন করল তখন তার ফল হলো তারা কুফর ও শিরকে পতিত হওয়ার সাথে সাথে তারা এ দাবী ও করে বসল যে ঈসা (عليه السلام) আল্লাহর পুত্র। এই জন্যেই তিনি বলেনঃ

إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله

অর্থঃ "আমি তো একজন বান্দা, অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলই বল।"

৫। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلوا...... من كان قبلكم الغلو

এই হাদীসে সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা বাড়াবাড়িই হলো সমস্ত খারাপীর কারণ। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অবলম্বন হলো সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

৬। ولمسلم: عن ابن مسعود..... هلك المتنطعون قالها ثلاثًا

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় এবং পরবর্তী দুই অধ্যায় ভালভাবে বুঝতে পারবে সে জানতে পারবে যে, ইসলাম আগে অপরিচিত অবস্থায় দুনিয়ায় এসেছে। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরক দেখা দিয়েছে নেক্‌কারদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে।

৩। কিসের মাধ্যমে নবীদের দ্বীনের বিকৃতি ঘটেছে তা জানা এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে এ কথাও জানা যে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে পাঠিয়েছেন

৪। শরীয়ত ও প্রকৃতি বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিদআতকে গ্রহণ করার কারণ কি তা জানা।

৫। হককে বাতিলের সাথে মিশিয়ে ফেলাই হচ্ছে এর কারণ। প্রথমটি হচ্ছে সালেহীনদের প্রতি ভালবাসা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে বিদআত ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬। সূরায়ে নূহে উল্লেখিত ২৩নং আয়াতের তাফসীর।

৭। মনের মধ্যে হকের পরিমাণ কম এবং বাতিলের পরিমাণ বেশি থাকা মানুষের স্বভাব সূলভ বৈশিষ্ট্য।

المتنطعــون দ্বারা এমন লোকেরা উদ্দেশ্য যারা স্বীয় কথায়-কাজে ও কোন জ্ঞানার্জনে এমন চরম বাড়াবাড়ি করবে এবং চরম পন্থা অবলম্বন করবে যার আল্লাহ অনুমতি দেননি।

تنطع، إطراء، غلــو সমার্থবোধক শব্দ তবে غلــو শব্দেই সব অর্থ এসে যায়। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) এ অধ্যায়ে সাব্যস্ত করেন যে, বনী আদমের কুফরীর কারণ হলো তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করা ও সৎব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। যেমনঃ নূহ (عليه السلام) এর জাতি সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, তাদের কবরে গিয়ে অবস্থান নেয় ও পরবর্তীতে তাদের পূজা শুরু করে। তেমনি খ্রিস্টানরা তাদের রাসূল ঈসা (عليه السلام), হাওয়ারী ও তাদের পাদরীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে পরিশেষে তাদেরকেও আল্লাহর সাথে মা'বূদ শুমার করে। অনুরূপ এ উম্মতের লোকেরাও নবী (ﷺ) এর জন্যেও আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু তাঁর জন্য সাব্যস্ত করে, অথচ নবী (ﷺ) এই সবই নিষেধ করেছেন।

৮। এতে সালফে সালেহীন থেকে প্রমাণ রয়েছে যে, বিদআত কুফরীর কারণ।

৯। আমলকারীর নিয়ত যতই মহৎ হউক না কেন, বিদআতের পরিণতি কি তা শয়তান ভালো করেই জানে।

১০। অতিরঞ্জনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এবং অপব্যাখ্যা সম্পর্কে নীতিমালা জানা।

১১। ভাল কাজের উদ্দেশ্য করে হাঁটু গেড়ে কবরের পাশে বসার অপকারিতা।

১২। মূর্তি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এবং ওগুলি দূর করার রহস্য।

১৩। নূহ (عليه السلام)এর জাতির ঘটনাটির গুরুত্ব জানা এবং এর অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা। অথচ মানুষ এ বিষয়েই গাফিল।

১৪। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বিদআত পন্থীরা তাফসীর ও হাদীসের কিতাবগুলিতে শিরক ও বিদআতের কথাগুলিকে পড়েছে এবং আল্লাহর কালামের অর্থও তারা জানতো, শিরক ও বিদআতের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। তার পরও তারা বিশ্বাস করতো যে নূহ (عليه السلام) এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরী যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়।

১৫। একথা স্পষ্ট যে, তারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছু চায়নি।

১৬। তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যে সব পন্ডিত ব্যক্তিরা ছবি ও মূর্তি তৈরি করেছিল তারাও শাফাআত লাভের আশা পোষণ করতো।

১৭। "তোমরা আমার মাত্রারিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে খ্রিস্টানেরা মরিয়ম তনয়কে করতো।" রাসূল (ﷺ) তাঁর এ মহান বাণীর দাওয়াত তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে পৌছিয়েছেন।

১৮। বাড়াবাড়ি কারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে-এই মর্মে আমাদেরকে রাসূলের উপদেশ।

১৯। ইলমকে ভুলে যাওয়ার পরই লোকেরা সূত্রগুলোর পূজা শুরু করে। এতে ইলম থাকার কদর এবং না থাকার ক্ষতি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

২০। আলেমগণের মৃত্যু ইলম উঠে যাওয়ার কারণ।

অধ্যায়-১৯

নেক্কার লোকের কবরে আল্লাহ্র ইবাদত করার ক্ষেত্রে যদি কঠোরতা আসে তাহলে নেক্কার ব্যক্তির ইবাদত করার ক্ষেত্রে কি কঠোরতা আসতে পারে।*

সহীহ হাদীসে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে। উম্মে সালামাহ আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) এর নিকট একটি গির্জার বর্ণনা দেন যেটি তিনি হাবশায় দেখেছিলেন এবং তাতে ছিল কয়েকটি ছবি। মহানবী (ﷺ) বললেনঃ

«أُولٰئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولٰئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ»(صحيح البخارى، الصلاة، باب تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ح:٤٢٧، ٤٣٤،١٣٤١ وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، ح:٥٢٨)

---

* আলোচ্য অধ্যায় ও এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ) স্বীয় উম্মতের হিদায়াতের জন্য একান্ত আগ্রহী ছিলেন। এই জন্য তিনি উম্মতকে প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে সতর্ক করে দেন ও তার উপকরণগুলি বন্ধ করে দেন যা কিছু শিরক পর্যন্ত পৌঁছার কারণ হতে পারে। এখানে এমন ধরনেরও শিরকের ব্যাপারে কঠোরতা এসেছে যে, কেউ যদি কোন সৎ ব্যক্তির কবরে এই উদ্দেশ্যে আসে যে সে সেখানে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে কিন্তু সেখানের বরকত কামনার মাধ্যমে। এ ধরনের উদ্দেশ্য বহুলোকের হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, সৎব্যক্তিদের কবর ও তার নিকটবর্তী জায়গা বরকতময় এবং সেখানে ইবাদত করা সাধারণ জায়গা থেকে ভিন্ন। যেহেতু ঐ কবরগুলির নিকটে আল্লাহর ইবাদত করার অনুমতি নেয় তবে উক্ত কবর বা কবরে শায়িত ব্যক্তির কিভাবে ইবাদত জায়েয হবে? অথচ দেখা যায় যে, কবর ভক্তদের প্রবণতা কখনো কবরের দিকে কখনো, কবরবাসীর প্রতি বরং কখনো দেখা যায় কবরের আশে-পাশে। সুতরাং ওলীদের কবরের ভিত্তি-বাউন্ডারী মাজারে পরিণত হয়। কখনো কবরের লোহার বেস্টনীকেই মা'বূদ বানিয়ে নেয়া হয়। কেননা যখন তা স্পর্শ করে বরকতের নিয়তেই স্পর্শ করে এবং তারা সেটিকে আল্লাহর নিকট পৌঁছার উসীলা মনে করে নামাযরত বসার মতই বসে এবং তার ইবাদত করে তার প্রত্যাশা রাখে ও তাকে ভয় পায়।

"তাদের মধ্যে কোন নেক্কার লোক অথবা বান্দা মারা গেলে তারা তার কবরে একটি মসজিদ তৈরি করত এবং তাতে ঐ ছবিগুলি তৈরি করত। তারা আল্লাহ্র নিকৃষ্ট সৃষ্টি। তারা এখানে দুইটি ফেতনা একত্রিত করেছে। কবরের ফেতনা এবং ছবি ফেতনা।"[1]

বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে। যখন আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হলো তিনি তার মুখে এক টুকরো কাপড় রাখলেন। এতে যখন অসুবিধা দেখা দিল তখন ওটি সরিয়ে ফেললেন। তিনি ঐ অবস্থায় বললেনঃ

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ»
(صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:٣٤٥٣، ١٣٩٠ وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ح:٥٢٩)

"ইয়াহুদী, খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এমনটি না হলে তাঁর কবর উন্মুক্ত করা হত।[2] তবে

১। في الصحيح عن عائشة ... بأن أم سلمة ذكرت ... فيه تلك الصور
মসজিদ প্রত্যেক ঐ স্থানকেই বলা হয় যে স্থানকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়। আর উক্ত সৎব্যক্তিদের কবরে আস্তানা ও উক্ত কবর ও কবরের আশে পাশের বাউন্ডারীতে তার প্রতিকৃতি এ জন্যই ছিল যে, যেন লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকেই আহ্বান করার সাথে সাথে উক্ত সৎব্যক্তি ও তার কবরের সম্মান ও মর্যাদা করা হয়। সুতরাং তারাই হলো অর্থাৎ যারা সৎ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করতঃ তাদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। অথচ উক্ত হাদীসে এ ধরনের কথা নেই যে তারা ঐ সৎলোকদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল বরং তারা শুধু তাদের কবরকে সম্মান প্রদর্শন করেছিল ও প্রতিকৃতি তৈরি করেছিল। সুতরাং তারা দুই ফিতনার সমন্বয় ঘটিয়েছিলঃ কবরের ফিতনা ও প্রতিকৃতির ফিতনা। আর উভয় ফিতনা হলো মহা শিরকের উসীলা। এ থেকে আমরা এ উম্মতের মধ্যে কারো কবরে ইবাদতগাহ বানিয়ে নেয়ার হুশিয়ারিই বুঝতে পারি।

২। ولهما عنها যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মৃত্যুাসন্ন হলোঃ ... طفق يطرح خميصة له علـى وجهـه এ হাদীসটি শিরকের উসীলা, ওলী ও সৎলোকদের কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ও কবরে মসজিদ নির্মাণ করার প্রতি কঠোরতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন হাদীস। কেননা নবী (ﷺ) অতি কষ্ট, অস্থিরতা ও মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ও এ বিষয়টি ভুলে যাননি। বরং তিনি স্বীয় উম্মতকে শিরকের উসীলাগুলি থেকে বাঁচার জন্য এমতাবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন এবং তিনি ইহুদী

সেটিকে নামাযের স্থান বানিয়ে নেয়া হতে পারে এই আশংকা করা হয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

ও খ্রিস্টানদের প্রতি অভিশাপ ও বদদোয়া করেন। কেননা তারা পূর্ববর্তী নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় নবী (ﷺ) এ আশংকা করেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের কবরকে যেমন মসজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে নেয়া হয়েছে। অনুরূপ হয়ত তাঁর কবরকেও বানিয়ে নেয়া হবে। আর তিনি যে অভিশাপ করেছেন তার দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সাহাবাদেরকে উক্ত কর্ম থেকে সতর্ক করা এবং জানিয়ে দেয়া যে, তাদের ঐ কৃতকর্ম কবীরা গুনাহ্ ছিল। অতএব এ থেকে তারা যেন বেঁচে থাকে।

কোন কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে নেয়ার তিনটি রূপঃ (প্রথমঃ) কবরে সিজদা করা এ হলো সবচেয়ে ভয়াবহ। (দ্বিতীয়ঃ) কবর সম্মুখে রেখে নামায আদায় করা। এমতাবস্থায় যেহেতু কবর ও তার আশ-পাশের জায়গাকে বিনয়-নম্রতা প্রকাশের জায়গা বানিয়ে নেয়া হয়। অথচ মসজিদ হলো বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের স্থান। এজন্যই নবী (ﷺ) কবর সম্মুখে রেখে নামায আদায় করতে নিষেধ করেন। কেননা কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা তার সম্মান ও মর্যাদা দানের একটি উসীলা ও কারণ। আর এ অবস্থাটিই শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। (তৃতীয়ঃ) মসজিদের অভ্যন্তরে কবর দেয়া। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা নবীকে দাফন করে তার কবরের পার্শ্বে বিল্ডিং তৈরি করে তার চারপার্শ্বকে মসজিদে পরিণত করে। সেখানে তারা ইবাদত ও নামায আদায় করত।

নবী (ﷺ) কে সাধারণ কবরস্থানে দাফন না করার কারণঃ (১) আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ) কে বাইরে সাধারণ কবরস্থানে এই ভয়ে দাফন করা হয়নি যে, তার কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে সেখানে পূজা করা শুরু হত। (২) কারণ হলো আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) বলেনঃ অর্থঃ “নবীগণের যেখানে মৃত্যু হয় সেখানেই দাফন করা হয়।” সাহাবায়ে কেরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) নবী (ﷺ) এর ভীতি প্রদর্শন গ্রহণ করেন ও তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী আমল করতঃ তাঁরা রওজা শরীফ (নবী ﷺ এর বাড়ী ও তাঁর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে রওজা বলা হয়।) থেকে তিন মিটার বা তার চেয়েও কিছু অতিরিক্ত জায়গা নিয়ে প্রথমে এক দেয়াল ছিল তারপর দ্বিতীয় দেয়াল তারপর তৃতীয় দেয়াল অতপর লোহার বেড়া দেন। সাহাবাদের একাজটি ছিল নবী (ﷺ) এর নির্দেশের প্রতিফলন। আর এ কাজের জন্য মসজিদেরও কিছু অংশ নেয়াকে তাঁরা বৈধতা দেন যেন নবী (ﷺ) কবরের নিকটে সিজদা না দেয়া হয় এবং সেখানে ইবাদত হওয়া থেকে তাঁর কবর সংরক্ষিত থাকে। নিশ্চয়ই উক্ত কাজটি চিন্তাশীলদের জন্য হয়েছে। কিন্তু যারা চিন্তাশীল ও প্রকৃত বিবেকবান নয় তারা মনে করে যে কবর রয়েছে মসজিদের অভ্যন্তরে। প্রকৃতপক্ষে তো কবর মসজিদের অভ্যন্তরে নয় কেননা কবর ও মসজিদকে পৃথক করার জন্য রয়েছে কয়েকটি দেয়াল ও বেড়া এবং কবরের পূর্ব পার্শ্বেও মসজিদের অংশ নয়। ফলকথা নবী (ﷺ) এর কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের জায়গা বানিয়ে নেয়া হয়নি।

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি মহানবী (ﷺ) কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বলতে শুনেছিঃ

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَّكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ»(صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ح:٥٣٢)

"তোমাদের মধ্যে থেকে আমার কোন বন্ধু হোক তা থেকে আমি আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করি। কারণ, আল্লাহ্ আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন যেমনভাবে তিনি ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বা সাজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিও না। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের নিষেধ করছি।"

তিনি শেষ জীবনে এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি এর পরিকল্পনাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। কবরকে মসজিদ না বানালেও সেখানে নামায পড়া এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত এর অর্থ এটিই। কারণ সাহাবীগণ কেউ তার কবরের পাশে মসজিদ বানাতেন না। ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই নামাযের ইচ্ছা করা হয় অথবা নামায পড়া হয় সে স্থানটিই মসজিদ। মহানবী (ﷺ) হাদীসে এরূপই বলেছেন, "আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও তাহারাতের (পবিত্রতার) উপকরণ বানানো হয়েছে।[3]

৩। ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم......... قبور أنبيائهم مساجد
বর্তমানে এ উম্মতের মাঝেও অনুরূপ ফিতনা জারী হয়ে চলেছে যেমন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝে ছিল। এ হলো শিরকের বড় মাধ্যম ও কারণ। আর মাধ্যম ও কারণ সব সময় তার পরবর্তী

ইবনে মাসউদ (ﷺ) থেকে মারফূভাবে উত্তম সনদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ

«إِنَّ مِنْ شِـرَارِ النَّـاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّـاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِـذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِـدَ»(مسند أحمد:٥٣١٦ وصحيح ابن خزيمة، ح:٧٨٩)

"মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারাই যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত আসবে আর তারা ঐ সময় কবরসমূহকে সাজদার স্থান বানিয়ে নিবে।" আবূ হাতিম সহীহ হাদীসে এটি বর্ণনা করেছেন।[4]

উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যায়। উলামা ও গবেষকদের ঐক্যমতে স্বীকৃত কায়দা হলোঃ শিরক ও অন্যান্য হারাম কর্মের দিকে নিয়ে যাবে এমন ধরনের উসীলা-মাধ্যম ও কারণ সমূহের মুলোৎপাটন করা ও ওয়াজিব। এজন্যেই কোন কবরে নির্মিত মসজিদে নামায আদায় করা জায়েয নয়। কেননা তা নবী (ﷺ)এর নিষিদ্ধ বিষয়ের পরিপন্থী। অতএব যে মসজিদ কোন কবরে নির্মিত সে মসজিদে এবং কবরের আশে-পাশে নামায আদায় করা জায়েয নয়। সেখানে বরকতের উদ্দেশ্যেই হোক আর জানাযা ব্যতীত অন্যান্য কোন নফলই হোক কোন নামাযই জায়েয নাই। চাই তা কবরে নির্মিত মসজিদ আকারে হোক বা মসজিদ আকারে না হোক। যেমনঃ সহীহ বুখারীতে তা'লীকরূপে বর্ণনা হয়েছে, ওমর (ﷺ) আনাস (ﷺ) কে এক কবরের নিকট নামায আদায় করতে দেখে বলেনঃ "কবর" "কবর" অর্থাৎ কবর থেকে বাচুন, কবর থেকে বাচুন (কবরের নিকটে নামায আদায় করবেন না) এ থেকে বুঝা গেল যে কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করা জায়েয নয়। কেননা তা হলো শিরকের বড় মাধ্যম ও কারণ।

৪। ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود .... أبو حاتم في صحيحه

হাদীসে বর্ণিত "যারা কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" এর মধ্যে প্রত্যেক ঐ ধরনের লোক অন্তর্ভুক্ত যারা কবরের উপর নামায আদায় করে বা তার দিক হয়ে বা তার নিকটে নামায আদায় করে। এজন্যেই কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করার ইচ্ছা পোষণ কারীরা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নবী (ﷺ) যাদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। প্রিয় পাঠক! এর সাথে সাথে মুসলিম দেশসমূহে কবরের উপর বিল্ডিং বা কবর পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মানের যে প্রথা শুরু হয়েছে এবং সেখানে আস্তানা গড়া, তার সম্মান প্রদর্শন, লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা, ও উক্ত কবরবাসীদেরকে ওলী সাব্যস্ত ও প্রকাশ করে তাদের ফযীলত ও প্রশংসায় লম্বা-চওড়া কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয় যে এ ওলীগণ লোকদের আহ্বান শুনে ও ফরিয়াদ কবূল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দ্বারা বর্তমান ও অতীতকালে খাঁটি ইসলামের চরম অসহায়ত্বের প্রকাশ ঘটে। অবস্থা এতটুকুই নয় বরং তারা এগুলিকে জায়েয বলে এবং এগুলিই তারা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করে তাদেরকে

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যে ব্যক্তি নেক্‌কারদের কবরের পার্শ্বে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানাই তার নিয়ত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর হুশিয়ারী।

২। মূর্তি তৈরি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং এ বিষয়ে কঠোরতা।

৩। কবরে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি প্রথমেই কিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতপর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে তিনি যা বলার তা বলেছেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যা বলার তা বলেছেন। অতএব রাসূল (ﷺ) কর্তৃক এ ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

৪। নবী (ﷺ) এর কবর হওয়ার পূর্বেই তাঁর কবরে এরূপ করতে নিষেধাজ্ঞা।

৫। নবীগণের কবরে এরূপ করা ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের রীতি।

৬। ঐ সমস্ত কাজের জন্য মহানবী (ﷺ) তাদেরকে অভিশাপ দেন।

৭। এর উদ্দেশ্য হল আমাদের তাঁর কবর সম্পর্কে সতর্ক করা।

৮। তার কবরকে উন্মুক্ত না করার কারণ।

৯। কবরে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ।

১০। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দু'ধরনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতপর কোন পথ অবলম্বন করলে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি তাও উল্লেখ করেছেন।

১১। রাসূল (ﷺ) তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদআতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি দলের জবাব দিয়েছেন। বরং কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিদআতীদেরকে বাহাত্তর দলের বহির্ভূত বলে

তারা অজ্ঞতার অপবাদ দেয় অথচ এরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে আহ্বান করছে, আর তারা তো আহ্বান করছে জাহান্নামের পথে। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমরা ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি।

মনে করেন। এসব বিদআতীরা হচ্ছে "রাফেযী" ও "জাহমিয়া"। রাফেযী দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম তারাই কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২। মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) কে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

১৩। মহানবী (ﷺ) কে খলীল এর মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

১৪। খুল্লাত হচ্ছে মুহাব্বত ও ভালবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫। একথা প্রমাণিত হয় যে, আবূ বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) শ্রেষ্ঠ সাহাবী।

১৬। আবূ বকর (رضي الله عنه) এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা।

অধ্যায়-২০

নেককারদের কবরে বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে মূর্তির ইবাদত করা হয়।*

মালেক তাঁর মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَـنًا يُعْبَدُ، اِشْـتَـدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(الموطأ لأمام مالك، الصلاة، باب جامع الصلاة، ح: ٢٦١ والمصنف لابن أبي شيبة: ٣/ ٣٤٥)

"হে আল্লাহ্, তুমি আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত কর না যার ইবাদত করা হয়। যে জাতি তাদের নবীর কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে সে জাতির উপর আল্লাহ্ অত্যন্ত রাগান্বিত।"[১]

---

* শরীয়তে নেককার ও সাধারণ লোকের কবরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সকলের কবরের বিধান এক ও অভিন্ন। গম্বুজ আকৃতি উঁচা কবর হোক আর --- হোক। শরীয়তের দলীলেও নেককার ও অন্যদের কবরের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং নেককারদের কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির অর্থ হলো, তাদের ব্যাপারে যা হুকুম দেয়া হয়েছে আর যা কিছু নিষেধ করা হয়েছে তার সীমালঙ্ঘন করা। কবরে লিখা, কবর উঁচু করা, তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করা কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়া, কবরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উসীলা বা মাধ্যম মনে করা, কবর অথবা কবরবাসীকে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াতকারী ধারণা করা। কবরে মানসিক করা, জবাই করা অথবা কবরের মাটিকে শাফায়াতকারী মনে করা ইত্যাদি সবগুলিকেই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উসীলা বিশ্বাস করা আল্লাহর সাথে মহা শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

১। روى مالك فى الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .....لاتجعل قبرى وثناً يعبد..

নবী (ﷺ) স্বীয় কবরে পূজা উপাসনা শুরু হওয়ার আশংকায় এ দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন যে, হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না। যার পূজা উপাসনা করা হবে। এর উদ্দেশ্যই হলো, যে কবরের পূজা ও উপাসনা করা হয় তা মূর্তিরই অন্তর্ভুক্ত। আর ঐ পূজার কারণে আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে থাকেন যা হাদীসের শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে। শিরক পর্যন্ত পৌঁছায় এমন উসীলা গ্রহণ করাই কবরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। নবী (ﷺ) এই হাদীসে যেখানে কবরের পূজার মাধ্যম বর্ণনা দিয়েছেন সেখানেই তা থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে ঐ নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের আল্লাহর মারাত্মক রাগেরও হুশিয়ারী দেন। আরো বর্ণনা দেন যে, পরিশেষে উক্ত উসীলা-মাধ্যমের পরিণতি এ দাঁড়ায় যে, মূর্তির মতই কবরগুলির পূজা শুরু হয়ে

ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেনঃ

﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ﴾

অর্থঃ "তোমরা কি লাত ও উয্যাকে দেখেছ?" (সূরা নাজমঃ ১৯)

তিনি (সনদে বর্ণিত মুজাহিদ) বলেন, "লাত" লোকদের জন্য ছাতু গুলতো। সে মারা গেলে লোকেরা তার কবরের পাশে অবস্থান গ্রহণ করলো। ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আবুল জাওযা ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সে হাজীদের জন্য ছাতু গুলতো।[২]

ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (سنن أبي داود، الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ح:٣٢٣٦ وجامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، ح:٣٢٠ وسنن النسائي، الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ح:٢٠٤٥)

"আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) কবর যিয়ারত কারিনীদের অভিশাপ এবং কবরকে যারা মসজিদ বানিয়ে ও তাতে প্রদীপ জ্বালায় তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।" আহ্‌লুস্ সুনান এটি বর্ণনা করেছেন।[৩]

যায়। মূলকথা, উক্ত হাদীসে একথায় স্পষ্ট করে দেয় যে, যে কবরের পূজা করা হয় তা মূর্তিই বটে।

২। ولابن جرير بسنده عن سفيان ...... فعكفوا على قبره

لات "লাত" যেহেতু হাজীদেরকে ছাতু গুলে খাওয়াত তার এই কর্মের কারণে লোকেরা তার কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকার হয়। আর সেখানে নামাযে বসার মত বসার রহস্য হলো, কবরের সম্মান করতঃ বরকত, নেকী, উপকার লাভ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার আশায় কবরে বসে থাকা। কবরের নিকট উক্ত ভাবে বসাতে কবর মূর্তি ও পূজার আস্তানায় পরিণত হয়।

৩। ..... وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

কবরে মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে বাতি জ্বালানো নিষেধ। কেননা তা হলো তার সম্মানে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন। অতীতকালে কবরে চেরাগ ও মোমবাতি জ্বালানো হত কিন্তু বর্তমানে বড় ধরনের আলোকসজ্জা ও লাইটিং করা হয় যাতে লক্ষ্য স্থল ভালভাবে চিহ্নিত হয় ও ব্যাপক

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। "আওসান" বা মূর্তির এর ব্যাখ্যা।

২। "ইবাদত" এর ব্যাখ্যা।

৩। যেটি সংঘটিত হওয়ার আশংকা রয়েছে সেটি থেকেই মহানবী (ﷺ) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

৪। নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তিপূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫। আল্লাহ্‌র অত্যন্ত ক্রোধ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

৬। এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি "লাতের" ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেল।

৭। লাত ছিল একজন নেককার লোক, তা জানা গেল।

৮। "লাত" প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্য ও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। মহানবী (ﷺ) কর্তৃক কবর যিয়ারত কারিনীদের অভিশাপ দান।

১০। মহানবী (ﷺ) কর্তৃক কবর আলোকিতকারীকে অভিশাপ দান।

সম্মান প্রকাশ পায়। কবরের উপর এরূপ করা নাজায়েয এবং নবী (ﷺ) এর বাণী অনুসারে এগুলো যে করবে সে অভিশপ্ত।

অধ্যায়-২১
মহানবী (ﷺ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ ও শিরকের পথ রুদ্ধকরণ সম্পর্কিত

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থঃ "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল তোমাদের দুঃখ কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ন।"[১] (সূরা তাওবাঃ ১২৮)

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

«لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً وَّلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَّصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»(سنن أبي داود، المناسك، باب زيارة القبور، ح:٢٠٤٢)

"তোমরা তোমাদের বাড়ি ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে নিও না। আর আমার কবরকে উৎসব স্থল বানিয়ে নিও না। আমার প্রতি দরূদ পড়। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছাবে।"[২]

১। অর্থাৎ তাঁর উম্মত কোন কিছু ক্লেশের মধ্যে পড়ে যাক এটি মহানবী (ﷺ) চান না। আর তিনি যে তাঁর উম্মতের হিতাকাঙ্খী তার দলীল হলো, তিনি তাওহীদের সীমারেখাকে যেমন পূর্ণ ভাবে সংরক্ষণ করেছেন, অনুরূপ আমরা যেন শিরকে পতিত না হই এজন্য সমস্ত পথকে বন্ধ করেছেন।

২। মূলে আরবীতে 'ঈদ শব্দ এসেছে। এর অর্থ উৎসব স্থান বাচক হতে পারে। যেমন, হাদীসে রয়েছে আবার কাল বাচকও হতে পারে। অর্থাৎ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কবরের নিকট সমবেত হওয়া। "আমার কবরকে উৎসবস্থল বানাইবেনা।" অর্থাৎ বছরে কোন নির্দ্ধারিত দিবস অথবা নির্দিষ্ট সময়গুলিতে মেলা বা উরস করে সেখানে আগমন করবে না। কেননা এর ফলে নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর সম্মানের মত হয়ে যায়। যেহেতু কবরকে উরস ও মেলা বানানো শিরকের উসীলা এজন্যে নবী (ﷺ) বলেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকনা কেন সেখান থেকেই আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। কেননা তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে যায়।"

আবূ দাউদ উত্তম সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

আলী বিন আল হুসাইন (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে মহানবীর কবরে যে একটি ফাঁকা ছিল সেদিকে আসতে দেখলেন। সে ওখানে ঢুকে দু'আ করবে। তিনি তাকে নিষেধ করে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলব না যেটি আমার পিতার নিকট থেকে শুনেছি। তিনি আমার দাদার নিকট শুনেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) এর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেনঃ

«لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَّلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَّصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»(رواه الضياء المقدسي في المختارة، ح:٤٢٨ ومجمع الزوائد: ٤/ ٣)

"তোমরা আমার কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করনা। তোমাদের বাড়ি-ঘরকেও উৎসব স্থলে পরিণত কর না। আর আমার উপর দরূদ পড়। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।"[৩]

আবূ দাউদ এটি নির্বাচিত হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেছেন।

৩। মহানবী (ﷺ) তাওহীদ সংরক্ষণ করেছেন। শিরকের সকল পথ রুদ্ধ করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এটি একটি শিরকের পথকে সুগম করে। যখন নবী (ﷺ) এর কবরের সম্মানে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ তবে অন্য লোকের কবরে এ ধরনের সম্মান করা তো কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, তাঁর অধিকাংশ উম্মত তাঁর নির্দেশনাকে গ্রহণ করে না বরং তাঁর হিদায়েতও নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে কবরকে মসজিদ ইবাদতের স্থান বানায় ও সেখানে উরস ও মেলা উদ্‌যাপন করে। বরং তার উপর গম্বুজ বানায়, আলোক সজ্জা করে বরং সেখানে পশু জবাই করা হয়, মানত-মানসিক পূর্ণ করা হয়, কা'বা ঘরের মত তার চারি পার্শ্বে তাওয়াফ করা হয়, কবরের আশে-পাশের স্থানসমূহকে অনুরূপ পূত-পবিত্র মনে করে যেরূপ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পূত-পবিত্র বরকতময় হারাম শরীফ ; বরং কবর-মাজার ভক্তরা নবী বা কোন সৎব্যক্তি বা ওলীর কবরে আসলে এমন বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ ও নিরবতা অবলম্বন করে যে, আল্লাহর সামনেও তেমন করে না। এগুলি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর সরাসরি বিরোধিতা এবং তাদের সাথে শত্রুতার বহিপ্রকাশ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। শিরকের সীমা এলাকা থেকে তাঁর উম্মতকে অনেক দূরে সরিয়ে ফেলা।

৩। আমাদের প্রতি ভালোবাসা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

৪। বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর কবর যিয়ারতে নিষেধাজ্ঞা। অথচ তাঁর যিয়ারত সর্বোত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৫। বেশি বেশি যিয়ারত করতে নিষেধ করা।

৬। বাড়িতে নফল নামায পড়তে উৎসাহ দান।

৭। কবরস্থানে নামায পড়া যাবে না। এটিই সালফে সালেহীনের অভিমত।

৮। যতদূরেই মানুষ বাস করুক তার দরূদ ও সালাম মহানবীর নিকট পৌঁছে যায়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৯। নবী (ﷺ) এর আলমে বরযখে থাকা, তাঁর কাছে তাঁর উম্মতের আমলের মধ্যে দরূদ ও সালাম পেশ করা।

অধ্যায়-২২
এই উম্মতের কিছু লোক মূর্তি পূজা করে*

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

---

* মূলে আরবীতে (الأوثان) শব্দ এসেছে। মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে যা কিছুরই ইবাদত করে অথবা তার নিকট ফরিয়াদ করে, অথবা এ বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহর হুকুম ছাড়াই উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে অথবা তার থেকে গোপনে গোপনে ভয় পায়। যেমনঃ আল্লাহকে ভয় করা হয় তাকেই (وثن) বলা হয়। তাই সেটি মূর্তি হোক, মৃত ব্যক্তি হোক, কবর হোক অথবা অন্য কিছু হোক। তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তার অপরিহার্যতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় পাওয়া। শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদের প্রকার, মহা শিরক ও ছোট শিকের প্রকার এবং মাধ্যম ও কারণ সমূহ বর্ণনা করার পর শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) মাথায় এ প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, কোন লোক এমন কথাও বলতে পারে যে, উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ সঠিক। কিন্তু এ উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে তো মহা শিরকে পতিত হওয়া থেকে হেফাযত করা হয়েছে। কেননা নবী (ﷺ) বলেনঃ "শয়তান আরব ভু-খন্ডে নামাযী ব্যক্তিরা যে তার ইবাদত করবে এ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, অবশ্য সে তাদের পদস্খলনের চেষ্টা করতেই থাকবে।"
উক্ত প্রশ্নের উত্তরঃ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ যথাস্থানে হয়নি, শয়তান ঠিকই নিরাশ হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ শয়তানকে আরব ভু-খন্ডে যে একেবারে তার ইবাদত হবে না তা থেকে নিরাশ করেননি। দ্বিতীয়তঃ নবী (ﷺ) বলেন, শয়তান ঐ ব্যাপার থেকে নিরাশ হয় যে, জাযিরাতুল আরবে নামাযীরা তার ইবাদত করবে। আর নিঃসন্দেহে নামাযী ব্যক্তিরা তো লোকদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধই করে থাকে। আর সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ হলো আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা। যে সমস্ত মানুষ যথাযথভাবে নামায আদায় করে, শয়তান প্রকৃতই তাঁদের থেকে নিরাশ যে, তাঁরা কখনই তার ইবাদত করবেনা। অতএব, আমরা বলবঃ এই হাদীসের এ অর্থ নয় যে, এ উম্মতের কেউ শয়তানের ইবাদত করবে না। এ কারণেই নবী (ﷺ) এর ইন্তিকালের কিছু দিন পরেই আরবের এক গোষ্ঠী মুরতাদ হয়ে যায়, আর এতো শয়তানের ইবাদতের ফলেই, কেননা শয়তানের ইবাদতের অর্থ হলো তার অনুসরণ করা। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

অর্থঃ "হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নিকট এ অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৬০)
উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, যেমনভাবে শিরকে পতিত হওয়া ও ঈমান ও ঈমানের দাবী সমূহকে প্রত্যাখ্যান করা শয়তানের ইবাদত অনুরূপ তার আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করাও ইবাদত।

অর্থঃ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশপ্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে।"[১] (সূরা নিসাঃ ৫১-৫২)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ﴾

অর্থঃ "বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, তাদের কতক কে বানর ও শূকরে রূপান্ত রিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে।"[২] (সূরা মায়েদাঃ ৬০)

আল্লাহ্‌র বাণী–

﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾

অর্থঃ "তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললঃ তাদের স্থান মসজিদ নির্মাণ করব।"[৩] (সূরা কাহ্‌ফঃ ২১)

১। আকীদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যাতে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বিরোধী আবরণ রয়েছে সেটিকেই 'জীবত' বলা হয়। সেটি যাদু হতে পারে, জ্যোতিষী হতে পারে এমন নোংরা জিনিস হতে পারে যাতে মানুষের ক্ষতি হয়। শরীয়ত সীমালংঘন করে যারই ইবাদত অনুসরণ ও আনুগত্য করা হয় তাকেই 'ত্বাগুত' বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুসরণ ও আনুগত্যের সীমা হলো, যার আনুগত্য করা হবে সে এমন কাজের হুকুম দিবে যার শরীয়ত হুকুম দিয়েছে এবং এমন কাজ থেকে নিষেধ করবে যা থেকে শরীয়ত নিষেধ করেছে। অতএব, শরীয়তের গণ্ডি হতে বের হয়ে যার ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্য করা হবে সেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

সামঞ্জস্যতাঃ আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে উক্ত আয়াতের সামঞ্জস্য হলো, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও মূর্তি ও শয়তানের প্রতি ঈমান আনে এবং নবী (ﷺ) ও বলেছেন যে বিগত উম্মতদের মধ্যে যা কিছু দেখা দিয়েছিল এ উম্মতের মধ্যেও তা দেখা দিবে। এ উম্মতের মধ্যে যাদুর প্রতি ঈমান রাখবে এরূপ লোকও হবে এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবে। ফলকথা হলো তারা তাদের পূর্ববর্তীদের তরীকায় চলবে।

২। ত্বাগুতের ইবাদত ব্যাপক। এটি কবর পূজা হতে পারে, কবরবাসীকে প্রভু হিসেবে গণ্য করা, তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশকারী হিসেবে মানা প্রভৃতি হতে পারে। আর উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বহু লোক কবর, আস্তানা, গাছ ও পাথরের ইবাদতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

৩। যেহেতু এটি পূর্ববর্তী উম্মতে সংঘটিত হয়েছে তাই এই উম্মতেও সংঘটিত হবে।

আবূ সাঈদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ: فَمَنْ؟»(صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:٣٤٥٦ وصحيح مسلم، العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، ح:٢٦٦٩)

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ পুংখানুপুংখভাবে মেনে চলবে।[8] এমনকি তারা যদি 'দবর' এর গর্তে প্রবেশ করে তাহলে তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। লোকেরা বলল, আল্লাহ্‌র রাসূল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা? তিনি বললেন, তাহলে আর কারা?"[৫] (বুখারী ও মুসলিম)

সাওবান (ﷺ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«إِنَّ اللهَ زَوٰى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ

8। السنن শব্দের অর্থ পথ। অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথ অনুসরণ করবে। নবী (ﷺ)لتتبعن শব্দটি প্রয়োগ করে শপথ করতঃ এমন গুরুত্বসহ এ ভবিষ্যতদ্বানী করেন যে, এ উম্মত পূর্বের উম্মতের এমনভাবে অনুসরণ করবে এবং এমনভাবে তাদের সমতায় পৌঁছবে যেমন তিরের একপর দ্বিতীয় পরের একেবারে সমান সমান হয়ে থাকে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য থাকেনা।

৫। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতি সমূহের মধ্যে যে কুফরী ও শিরক দেখা দিয়েছে তা এই জাতির মধ্যেও দেখা দিবে।

اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَّنْ بِـأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْـضًا وَّيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا»(صحيح مسلم، الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح:٢٨٨٩)

"আল্লাহ্ আমার জন্য পৃথিবী চক্ষুসীমার যতটুকু আনা হয়েছে ততদূর পর্যন্ত আমার উম্মতের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হবে। আমাকে দুইটি ভান্ডার দেয়া হয়েছে একটি লাল ও অপরটি সাদা। আমি আমার প্রভুর নিকট আমার উম্মতের জন্য দু'আ করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের উপর চাপিয়ে না দেন যে তাদের শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলবে। (উত্তরে) আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের জন্য তোমার দু'আ মঞ্জুর করলাম তাদেরকে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করব না, তাদের ছাড়া তাদের উপর কোন শত্রু চাপিয়ে দিব না যে তাদের শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলবে যদিও তারা বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়; বরং তারা নিজেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে।"

বারকানী তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো আক্ষেপ করেছেনঃ

«وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّـهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَّأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاَ تَزَالُ طَائِـفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لاَ يَضُـرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى»(سنن أبي داود، الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ح:٤٢٥٢ ومسند أحمد:٥/٢٧٨، ٢٨٤)

“আমি আমার উম্মতের জন্য বিভ্রান্তকারী নেতাদের আশংকা করছি।”[৬] তাদের উপর তরবারী পড়ে গেলে কিয়ামত পর্যন্ত আর উঠবে না। আমার উম্মতের একজন জীবিত ব্যক্তি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[৭] আমার উম্মতে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আবির্ভূত হবে তাদের প্রত্যেকেই মনে করবে সে একজন নবী অথচ আমি শেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী নেই। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের ওপর থাকবে বিজয়ীর বেশে থাকবে।[৮] লাঞ্ছনা কারীর লাঞ্ছনা এবং বিরোধীতাকারীর বিরোধীতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশ আসে।”

৬। বিভ্রান্তকারী নেতা যাদেরকে লোকেরা গ্রহণ করে থাকে, তারা ধর্মীয় নেতা হতে পারে, আবার রাজনৈতিক নেতাও হতে পারে। তারা শিরক ও বিদ‘আতের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। আর সেগুলি তারা লোকদেরকে এমন সুন্দর করে দেখাবে যে তারা সেগুলি হক মনে করবে।

৭। মুসলিম দেশ ত্যাগ করে মুশরিকদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দেশে চলে যাবে অথবা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুশরিকদের মতোই শিরকে লিপ্ত হবে। তারও অনুরূপ শিরক করবে যেরূপ মুশরিকরা করেও তাদের সাথেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

৮। তাদের বিজয়ী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে একটি সমরাস্ত্রের বিজয় নয়। বরং দলীল প্রমাণ ও হকের বিজয়। যদিও কোন কোন যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছে বা কখনো তাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা স্বীয় দলীল ও প্রমাণে এবং অন্যদের তুলনায় হক ও সঠিকের প্রতি দৃঢ়তায় তারাই হকপন্থী আর অন্যরা বাতিল পন্থী।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরায়ে নিসার ৫১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। সূরায়ে মায়েদাহ্‌র ৬০নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। সূরায়ে কাহফের ২১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪। জীবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে "জিবত" এবং "তাগুত" এর প্রতি ঈমানের অর্থ কি ? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করা বুঝায়।

৫। ইহুদীদের কথা হচ্ছে, ঐ কাফেররা যারা তাদের কুফরী সম্পর্কে অবগত তারা মুমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬। আবূ সাঈদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীসে (পূর্বের উম্মতের মধ্যে) যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

৭। এই উম্মতে মূর্তিপূজা হবে- এ সম্পর্কে মহানবীর স্পষ্ট বক্তব্য।

৮। মুখতার ও তার মতো অন্যদের ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাওয়া। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, "মুখতারের মত মিথ্যা এবং ভন্ড নবীর আবির্ভাব। মুখতার নামক এ ভন্ড নবী আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রিসালাতকে স্বীকার করত। সে নিজেকে উম্মেতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত বলেও ঘোষণা করত, সে আরো ঘোষণা দিতো, রাসূল (ﷺ) সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মাদ সর্বশেষ নবী হিসেবে কুরআনে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃত প্রদান সত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভন্ড মুর্খও সাহাবায়ে কিরামের শেষ যুগে আর্বিভূত হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

৯। এই মর্মে সুসংবাদ প্রদান যে, হক পুরো পুরিভাবে দূর হয়ে যাবে না যেমন ইতিপূর্বে হয়েছে ; বরং একটি দল সত্যের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০। এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে তারা সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্বেও হক পন্থীদের কোন ক্ষতি হবে না।

১১। এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

১২। মহানবী হাদীসে যে সকল বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন তার সবগুলোই বাস্তবে ঘটেছে। উল্লেখিত হাদীসে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়ঃ নবী (ﷺ) খবর দেন যে, আমার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমকে দুমড়ে এক জায়গায় করে দিবেন। অতপর তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই হয়েছে ; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ব্যতীত।

– তাঁর খবর দেয়া যে তাঁকে দুই ভান্ডার দেয়া হয়েছে।

– তাঁর খবর দেয়া যে, উম্মতের ব্যাপারে তাঁর দুই দোয়া কবুল হয়েছে।

– এবং তৃতীয় দোয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি আরোও ভবিষ্যতবানী করেন যে, যদি তাঁর উম্মতের মধ্যে তরবারী ছুটে তবে কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না।

– নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের লোকেরা পরস্পর হত্যা ও বন্দিতে লিপ্ত থাকবে।

– তাঁর বিভ্রান্তকারী শাসকের ব্যাপারে আশংকা করা।

– এ উম্মতে ভন্ড নবীদের আবির্ভাবের খবর দেয়া।

– তাঁর খবর যে, এক সাহায্য প্রাপ্ত দল কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

– নবী (ﷺ) এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী সমস্ত বানীই তাঁর অক্ষরে অক্ষরে সাব্যস্ত হয়েছে যদিও সেগুলি বিবেকের বাইরে।

– নবী (ﷺ) এর উম্মতের প্রতি বিভ্রান্তকারী শাসকদের ব্যাপারে ভীতি সঞ্চার হওয়া।

১৩। আশংকাকে শুধু বিভ্রান্তকারী নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ।

১৪। عبادة الأوثان এর পূজার অর্থ সম্পর্কে সতর্কীকরণ।

অধ্যায়-২৩

যাদু *

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾

অর্থঃ "আর তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে সামান্যতম ও কোন অংশ নেই।"[১] (সূরা বাকারাঃ ১০২)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন–

﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

---

* যাদু শিরকে আকবার তথা বড় শিরক এর অন্যতম এবং তা তাওহীদের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যাদুর বাস্তবতা হচ্ছে যাদুকে কার্যকর এবং ক্রিয়াশীল করতে হলে শয়তানকে ব্যবহার এবং তার নৈকট্য লাভ করতেই হয়। আর শুধুমাত্র তার নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই জিন-শয়তান যাদুকৃত ব্যক্তির শরীরে যাদুর ক্রিয়া শুরু করে। শয়তানের নৈকট্য লাভ ছাড়া কোনো যাদুকরের পক্ষেই প্রকৃত যাদুকর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণেই আমরা বলবো যে, যাদু শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "(বলুন যে আমি পরিত্রাণ কামনা করছি) গিরা তথা বন্ধনে অধিক ফু দান কারিনীদের অনিষ্ট হতে।" نفّاثات শব্দটি نفّاثة এর বহুবচন এবং نفث/نفّاثة থেকে মুবালাগা তথা অতিমাত্রায় ফু দান করার অর্থ বহন করে এবং তা দ্বারা নিঃসন্দেহে যাদুকারিনী বুঝানো হয়েছে এবং সরাসরি যাদুকারিনী না বলে অতিমাত্রায় ফু দানকারিনী বলা হয়েছে। কেননা তারা অতি মাত্রায় ফু দান করতো এবং ঝাড় ফুঁক ও বিভিন্ন রকমের তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ফু দিত এবং সে ফু এর মাধ্যমে জিন সেই গিরা বন্ধনে কাজ করতো যাতে যাদুকৃত ব্যক্তির শরীরের কিছু একটা থাকতো অথবা এমন কিছু থাকতো যার সাথে যাদুকৃত ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে যাদু ক্রিয়াশীল হয়ে যেত।

১। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "আর তারা নিশ্চয় অবগত আছে যে, যে ব্যক্তি যাদু ক্রয় (অবলম্বন) করলো" এর অর্থ হচ্ছে যাদুকর ব্যক্তি যাদু ক্রিয়া করলো এবং বিনিময়ে তাওহীদ প্রদান করলো ফলে মূল্য হচ্ছে তাওহীদ আর পণ্য হচ্ছে যাদু" "ماله في الآخرة من خلق" যাদুকর ব্যক্তির পরকালে কোনো অংশ থাকব না, ঠিক একইরূপ অবস্থা মুশরিকদেরও হবে। পরকালে তাদের ভাগ্যেও কিছুই জুটবে না।

অর্থঃ "তারা জিবত্ ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস করে।"[২] (সূরা নিসাঃ ৫১)

উমর (ﷺ) বলেনঃ

«اَلْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوْتُ: الشَّيْطَانُ»(أخرجه الطبري في التفسير، برقم: ٥٨٣٤)

"জিবত্ হচ্ছে যাদু আর তাগুত হচ্ছে শয়তান।"

জাবির (ﷺ) বলেনঃ

«اَلطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَّاحِدٌ»
(أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور: ٢/ ٢٢ ورواه البخاري في الصحيح معلقًا، فتح الباري: ٨/ ٣١٧)

"তাগুত বলতে গণকদের বুঝানো হয়েছে। যাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো। আর সাধারণত প্রত্যেক গোত্রের জন্য একজন করে শয়তান নির্ধারিত থাকতো।"[৩]

আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ

২। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'তারা জিবত ও তাগুতে বিশ্বাস করে'। উমর (ﷺ) বলেন, জিবত হচ্ছে যাদু। উল্লেখিত আয়াতে আহলে কিতাবদের দোষারোপ ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে কেননা তারা যাদুতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর এটা সাধারণত ইহুদীদের ক্ষেত্রে অধিক দেখা যায়। একথা সুস্পষ্ট বলা যায় যে, যাদুবিদ্যা চর্চা ও তা অবলম্বনের কারণে আল্লাহ্ তাদের দুর্নাম করেছেন ও তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং তাদের প্রতি ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সুনিশ্চিত এটা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর যদি তাতে শেরেকী কথা থাকে তবে অবশ্যই সেটা শিরক বলেই গণ্য হবে। এভাবেই তার সমস্ত প্রকারের এক নির্দেশ।
তাগুত হচ্ছে শয়তান এবং জিবত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ হলেও ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট তা যাদুর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তারা যাদু ও শয়তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রকাশ করে হক থেকে দূরে সরে গেছে।

৩। জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (ﷺ) এর অভিমত, 'তাগুত দ্বারা গণককে বুঝানো হয়েছে। এর আলোচনা সামনে করা হবে।

بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»(صحيح البخاري، الوصايا، باب قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامىٰ ظلما﴾ ح:٢٧٦٦، ٥٧٦٤ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ح:٨٩)

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা। (২) যাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা–যা আল্লাহ তাআ'লা হারাম করে দিয়েছেন। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করা। (৭) সতী সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।"[৪]

জুনদুব (ﷺ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»(جامع الترمذي، الحدود، باب حد الساحر، ح:١٤٦٠)

"যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া (মৃত্যু দণ্ড)।"[৫] (তিরমিযী)

৪। আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেনঃ "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিষ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ঐ জিনিসগুলো কি কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা যাদু করা" ইত্যাদি। উপরোক্ত পাপগুলির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতেই ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং নিঃসন্দেহে এগুলি মহাপাপ। সুতরাং যাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৫। জুনদুব (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যাদুকরের হদ তথা শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা (মৃত্যুদণ্ড)। (তিরমিযী) ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন, সঠিক অর্থে হাদীসটি মওকুফ। শাস্তির ব্যাপারে মূলতঃ যাদুকরগণের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। যে কোন প্রকার যাদু হোক না কেন যাদুকরকে হত্যা করতে হবে এবং বাস্তবতা হচ্ছে যাদুকরের শাস্তি এবং মুরতাদের শাস্তি একই কেননা যাদুতে শিরক থাকেই। ফলে যে ব্যক্তি শিরক করল সে মুরতাদ হয়ে গেল এবং তার জানমাল বৈধ হয়ে গেল। (হত্যা যোগ্য হয়ে গেল)

সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, ওমর (ﷺ) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশ নামায় লিখেছেনঃ

«اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَّسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ»(صحيح البخاري، الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ح:٣١٥٦ وسنن أبي داود، الخراج، باب في أخذ الجزية من المجوس، ح:٣٠٤٣ ومسند أحمد:١/ ١٩٠، ١٩١ واللفظ له)

"তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো।" বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।[৬]

হাফসা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছেঃ

«أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَّهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ، وَكَذٰلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلاَثَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ»(الموطأ للإمام مالك، العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، ح:٤٦)

"তিনি তাঁর অধীনস্থ একজন ক্রীতদাসীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে যাদু করেছিলো। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"

৬। বাজালা বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ওমর (ﷺ) ফরমানজারী করেছিলেন যে, তোমরা প্রত্যেক যাদুকর এবং যাদুকারিনীকে হত্যা কর, তিনি বলেন, ফলে আমরা তিনজন যাদুকারিনীকে হত্যা করেছিলাম। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাদুকর এবং যাদুকারিনীকে হত্যার ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই।

একই রকম হাদীস জুনদুব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রাহঃ) বলেছেন, নবী (ﷺ)-এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

৭। হাফছা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার অধীনস্থ একজন ক্রীতদাসীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, দাসী তাকে যাদু করেছিল অতঃপর তিনি উক্ত দাসীকে হত্যা হয়েছিল। একই রকম হাদীস জুনদুব (رضي الله عنه) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, তিনজন সাহাবী থেকে যাদুকরকে হত্যার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) যাদুকরকে হত্যার ফতোয়া ও আদেশ প্রদান করেছেন এ মর্মে সেখানে কোনো রকম পার্থক্য করেননি এবং ইহাই ওয়াজিব যে, যেন কোনো প্রকার পার্থক্য করা না হয়। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব যে, তারা যাদুর সকল প্রকার থেকে সাবধান থাকবে এবং এ বিধান প্রচারে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে ও এ গর্হিত কাজের বিরোধীতা করবে যেমন ইমামগণ বলেছেন যে, যখনই কোনো যাদুকর কোনো নগরীতে প্রবেশ করবে তখনই সেখানে অশান্তি, অত্যাচার সীমালংঘন এবং সন্ত্রাস বিরাজ করবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা বাকারার ১০২নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর।

৩। জিবত এবং তাগুত-এর তাফসীর এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪। তাগুত কখনও জ্বিন আবার কখনও মানুষও হতে পারে।

৫। ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন যেগুলির নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৬। যাদুকরকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করা।

৭। যাদুকরকে তওবার সুযোগ ছাড়াই হত্যা করতে হবে।

৮। ওমর (রাঃ) এর যুগে যাদুবিদ্যার অস্তিত্বের প্রমাণ এ কথারই ইঙ্গিত করে যে পরবর্তী যুগের অবস্থা কত ভয়াবহ হবে?

অধ্যায়-২৪

যাদুর প্রকারভেদ*

ইমাম আহমাদ (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর তিনি বলেন, আউফ আমাদেরকে হাইয়ান বিন আ'লা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, কাতান বিন কাবিসা তাঁর পিতার নিকট থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ

«إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ»

"নিশ্চয়ই 'ইয়াফা' তারক্, এবং তিয়ারাহ হচ্ছে জিবত এর অন্তর্ভুক্ত।"[১]

বর্ণনাকারী আউফ বলেন, "ইয়াফা" হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। "তারক্" হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয় করা।

হাসান (রহঃ) বলেন, "জিব্‌ত" হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র।[২] হাদীসটির সনদ উত্তম। (আবু দাউদ, নাসায়ী) ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহতে মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ» (سنن أبي دواد، الكهانة والتطير، باب في النجوم، ح: ٣٩٠٥)

---

* যাদু ভাষাগত দিক থেকে একটি ব্যাপক শব্দ। শয়তানের সহযোগিতায় ও তার ইবাদত ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে যাদুকর যা কিছু প্রয়োগ করে তার সবই যাদুর পর্যায়ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তে কিছু বিষয়কে যাদু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেগুলো মূলতঃ কোনোভাবেই যাদু নয়। এর কতগুলো স্তর আছে এবং স্তরগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব জরুরী। এ অর্থেই মহামতি গ্রন্থকার (রঃ) অত্র অধ্যায়ে সবগুলো প্রকার উল্লেখ করেছেন।

১। নবী (ﷺ) বলেছেন, 'পাখি উড়িয়ে ও মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা জিব্‌ত এর অন্তর্ভুক্ত।' পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালোমন্দ নির্ণয় করা ইয়াফার অন্যতম একটি ব্যাখ্যা এবং মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয় করা মূলতঃ গণকদের কাজ যারা মাটিতে অনেকগুলো রেখা টেনে পর্যায়ক্রমে একটি দুটি করে মিটাতে থাকে এবং বলে যে রেখা বাকি আছে তার দ্বারা এই এই বুঝা যায় ইত্যাদি। মূলতঃ গণকবিদ্যা যাদুর একটা অংশ।

২। হাসান (রাঃ) বলেছেন, জিব্‌ত শয়তানের মন্ত্র বা মধুর সুর ইহা যাদুরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা শয়তান সেদিকে তার সুর দিয়ে মানুষকে আহ্বান করে।

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো, মূলতঃ সে যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো।[৩] এ জ্যোতির্বিদ্যা যত বাড়বে যাদুবিদ্যাও তত বাড়বে।" আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরা থেকে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছেঃ

«مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»(سنن النسائى، تحريم الدم، باب الحكم في السحرة، ح:٤٠٨٤)

"যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে।[৪] আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে। আর যে ব্যক্তি কোনো জিনিস (তাবিজ কবজ) লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়।"

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«أَلاَ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ: الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»(صحيح

৩। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ জ্যোতিবির্দ্যা যতো বাড়বে যাদু বিদ্যাও ততো বাড়বে।" (আবু দাউদ) এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অর্জন যাদুবিদ্যা শিক্ষারই পর্যায়ভুক্ত।

৪। যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। ফুঁক দেওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে সে এমন কিছু পড়ে ফুঁক দেয়, যা দ্বারা সে শয়তানকে ব্যবহার করে ও কথাগুলো প্রয়োগের সময় সে জিন হাজির করে এবং সেই জিন ফুঁকের মাধ্যমে উক্ত গিরাতে কাজ করে। যাদুকরের নিকট গিরা লাগানোর উপকার হচ্ছে যে, যতক্ষণ গিরা বলবৎ থাকবে ততক্ষণ যাদুও ক্রিয়াশীল থাকবে। গিরা কখনও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় আবার কখনও অতি ছোট ছোট ও সূক্ষ্ম হয়। যে যাদু করলো সে শিরক করল। এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি কোনো জিনিস লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ততা রাখে আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট আর যখন বান্দা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে তখন তাকে সেদিকে সোপর্দ করা হয়। অথচ আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী তিনিই একমাত্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের মালিক। "হে মানব সকল! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ্‌ প্রশংসিত ধনবান।"

مسلم، البر والصلة والأدب باب تحريم النميمة ح:٢٦٠٦ ومسند أحمد ١/ ٤٣٧)

"আমি তোমাদেরকে 'আদ' কি এ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা লাগানো বা বদনাম ছড়ানো।"[৫] (মুসলিম)

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»(صحيح البخارى، النكاح، باب الخطبة، ح:٥١٤٦، ٥٧٦٧ ومسند أحمد:٢/ ١٦، ٥٩، ٦٣، ٩٤)

"নিশ্চয় কোন কোন কথা ও আলোচনার মধ্যে যাদু আছে।[৬] (বুখারী ও মুসলিম)

৫। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীস, 'আমি কি তোমাদেরকে "আযাহ" (যাদু) এর সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রচনা করা।' হাদীসে বর্ণিত 'আযাহ' অর্থে ব্যবহৃত শব্দটির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি যাদুর অর্থ বহন করে। কুৎসা রটনাকে যাদুর অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে যে যাদু যেমন দু'জন বন্ধুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা দু'জন পৃথক ব্যক্তিকে একত্রিত করে এবং হৃদয়ে তার প্রভাব অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পূর্ন হয়, ঠিক তেমনি চোগলখুরীর মাধ্যমেও বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটে।

৬। ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই কোন কোন কথা বা আলোচনার মধ্যে যাদু আছে।' কতগুলো কথা একেবারে যাদুর মত অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা যা কখনও হৃদয় ছুঁয়ে যায় ও অন্তঃকরণে বিশেষ রেখাপাত করে এমন কি ভাষার জোরে হক বাতিল এবং বাতিলকে হক বলে মনে হয়।

উলামাদের সঠিক মতানুযায়ী এখানে বাক পটুতার সমালোচনা করা হয়েছে, প্রশংসা নয়। ফলে গ্রন্থকার (রাঃ) হাদীসটি অত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন, যাতে হারাম কাজগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। পাখি উড়িয়ে, মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয়করণ জিবত্ তথা যাদুর পর্যায়ভুক্ত।

২। ইয়াফা, তারক্ এবং তিয়ারাহ্ এর তাফসীর।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪। ফুঁকসহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫। কুৎসা রটনা করাও যাদুর শামিল।

৬। কিছু কিছু বাগ্মিতা ও যাদুর আওতায় পড়ে।

অধ্যায়-২৫

গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বর্ণনা *

ইমাম মুসলিম (রাহেমাহুল্লাহ) রাসূল (ﷺ) এর কোন এক স্ত্রী থেকে তাঁর সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»(صحيح مسلم، السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ح: ٢٢٣٠ دون قوله ؛فصدقه؛فهو عند أحمد فى المسند: ٤/ ٦٨، ٥/ ٣٨٠)

"যে ব্যক্তি কোন গণক তথা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আসল অতঃপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল তাহলে

---

* গণক বলতে ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষীদের বুঝানো হয়েছে, গণক বিদ্যা এমন একটি পেশা যা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং গণক মুশরিক বলে বিবেচিত। কেননা সে জিনদের ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের উপাসনা করে তাদের নৈকট্য লাভ করে এবং জিন তাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করে। জিনের উপাসনা ও তার নৈকট্য লাভ ছাড়া এটা আদৌ সম্ভব নয়। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ গণকদের নেতৃত্বে আস্থা রাখত এবং বিশ্বাস করত যে তারা গায়েব সম্পর্কে যা পৃথিবীতে অথবা মানব সমাজে ঘটবে তারা অবগত আছে। যার ফলে আরবরা গণকদের সম্মান করত ও তাদের প্রতি ভীত থাকত। জ্বীনদের প্রকৃত ব্যাপার ছিলঃ জিনেরা গোপনে চুরি করে ফেরেশ্তাদের পরস্পরের কথোপকথন শুনে ঐ গণক বা জ্যোতিষির নিকট বলে। শ্রবণ চুরি তিন অবস্থায়ঃ (১) নবুওয়াত এর পূর্বে এবং তা ব্যাপকভাবে ছিলো, (২) নবুওয়াত এর পরে জিনদের পক্ষে শ্রবণ চুরি সম্ভব হয়নি যদিও কিছু হয়েছে তবে তা আল্লাহ্র কিতাব বা কুরআনের ওহী ব্যতিরেকে। (৩) নবী (ﷺ) এর মৃত্যুর পর শ্রবণ চুরির ঘটনা পুর্নরাবৃত্তি ঘটলেও তা খুবই সীমিত আকারে, কেননা আসমানে পাহারার কঠোর ব্যবস্থা ও অগ্নি নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে ++ শব্দটি সহীহ মুসলিমে নেই বরং মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। যেহেতু উভয়ের বর্ণনা একই যার কারণে লিখক (রহঃ) আহলে ইলমের পথ অনুসরণ করতঃ একটির শব্দ অন্যটির দিকে সম্পর্কিত করেছেন। মূলতঃ গণক এবং আররাফ কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী ও জ্যোতির্বিদ গণকের পর্যায়ভুক্ত।

১। ইমাম মুসলিম (রঃ) রাসূল (ﷺ) এর কোন এক স্ত্রী থেকে তাঁর সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন গণক তথা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আসল অতঃপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।

চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।"[১] (মুসলিম)

আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»(سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الكهان، ح:٣٩٠٤)

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তাকেই অস্বীকার করলো।"[২] (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ।) আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাতিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইয়া'লা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয় করলো অথবা তার জন্য পাখি উড়ান হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল অথবা তার জন্য ভাগ্য গণনা করা হল অথবা যে ব্যক্তি যাদু করল অথবা যার জন্য যাদু করা হল অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে (গণক) যা বললো তা বিশ্বাস করল।[৩] সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর নাযিলকৃত জিনিস (কুরআন) কেই

চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না অর্থাৎ তার নামায আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে কেননা গণকের কাছে আগমণ তার চল্লিশ দিনের নামাযের সওয়াব নষ্ট করে দেবে এবং এও বোধগম্য হয় যে গণকের নিকট এসে কিছু জিজ্ঞাসা করাই মহাপাপ যদিও তা বিশ্বাস না করে শুধু ভবিষ্যত সম্পর্কে জানার আগ্রহের কারণে হয়ে থাকে।

২। 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তারই কুফরী করলো। অর্থাৎ যেন কুরআনকেই অস্বীকার করলো। কুরআন এবং হাদীসে বলা হয়েছে গণক, যাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা এরা পরিত্রাণ পাবেনা এবং তারা মিথ্যা বৈ সত্য বলে না এবং সঠিক মতে এখানে কুফরী ছোট কুফরী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। ليس منا এর দ্বারা বুঝা যায় যে উক্ত কাজ হারাম, আর কতিপয় ইমাম বলেন যে, তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। গণকদের কথা বিশ্বাস করা সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেনঃ সে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দ্বীনের সাথে কুফরী করল কেননা গণককে বিশ্বাস করার মাধ্যমে শিরকে আকবার তথা বড় শিরকে সহযোগিতা করা হবে। এ তো তার ব্যাপারে হুশিয়ারী যে গণকের নিকট এলো এবং শুধু জিজ্ঞাসা করল আর গণকের ব্যাপারে বর্ণনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে।

অস্বীকার করল। (হাদীসটি বায্‌যার উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।)

ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি আওসাতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ((ومـن أتـى)) থেকে হাদীসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসে উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী (রঃ) বলেন, গণক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে।[৪] এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়। (অর্থাৎ যে ভবিষ্যতবাণী করে) আবার কারো মতে, যে ব্যক্তি মনের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়।

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, গণক, জ্যোতির্বিদ এবং বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আর্‌রাফ (গণক) বলে।[৫]

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেছেন, এক গোত্রের কিছু লোক আরবী লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।[৬]

৪। ইমাম বাগাবী (রঃ) এর মতে আর্‌রাফ এবং কাহিন মূলতঃ একই জিনিসের দুই নাম।

৫। ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর মতে গণক জ্যোতির্বিদ এবং বালিতে দাগ কেটে ভাগ্য নির্ণয়কারী সকলকেই আর্‌রাফ বলা হয়েছে।

৬। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর মতে যে সম্প্রদায় আবজাদ পদ্ধতিতে ভাগ্য নির্ণয় করে ও তারকারাজিতে দৃষ্টিপাত করে তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই, তাদেরকেও গণকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোটকথা, গণক বিদ্যার প্রকার অসংখ্য কিন্তু সার কথা হচ্ছে যে গণক তার নিকট আগন্তুক ব্যক্তিকে বোকা বানায় যে সে, সঠিক জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, কিন্তু মূলতঃ সে বাস্তবতার বহুদূরে এবং সে যা কিছু দাবী করে তাও জিনের মাধ্যমে, কিন্তু দুর্বল ঈমানের লোকেরা ধারণা করে যে, তাদের নিকটও এক ধরনের জ্ঞান রয়েছে এবং তারা আল্লাহর অলী।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়।

১। গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২। ভাগ্য গণনা করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩। যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪। পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।

৫। যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।

৬। ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি 'আবজাদ' শিক্ষা করেছেন তার উল্লেখ।

৭। কাহিন, এবং আর্‌রাফ এর মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ।

অধ্যায়-২৬

নুশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা *

জাবের (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (ﷺ) কে নুশরাহ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেনঃ

«هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»

"এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ।"[১] (আহমাদ, আবু দাউদ)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে নুশরাহ (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, "ইবনে মাসউদ (ﷺ) এর (নুশরাহ) এর সবকিছু অপছন্দ করতেন।

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, "একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমাধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (নুশরাহ) এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা এর (নুশরাহ) দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।

---

* নুশরাহ্ অর্থ যাদু ক্রিয়া নষ্ট করা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটা অবৈধ, আন্নুশরাহ মূলতঃ নাশর থেকে নির্গত যার অর্থ সুস্থ্যভাবে রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা। যাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা পদ্ধতিকে আন্-নুশরাহ্ বলা হয়। নুশরাহ দু'প্রকারঃ প্রথমটি বৈধ, দ্বিতীয়টি অবৈধ। বৈধ নুশরাহ্ যখন তা কুরআন, হাদীস ও বর্ণিত দু'আ অথবা ডাক্তারের ঔষধের মাধ্যমে হবে। অবৈধ যা নিষিদ্ধ নুশরাহ প্রথম যাদুকে দ্বিতীয় যাদু দ্বারা নষ্ট করা। কেননা উক্ত যাদুতেও জিনের আশ্রয় গ্রহণ জরুরী এবং যেখানে কুফুরী অথবা শিরকী বাক্য থাকবেই। ফলে বলা হয়েছে যাদুকরই একমাত্র শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত যাদু নষ্ট করে থাকে।

১। জাবের (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) কে নুশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেন, এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ। আরবে সাধারণত প্রচলিত ছিলো যে 'শুধু মাত্র যাদুকররাই যাদুর প্রভাব নষ্ট করত।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ইবনে মাসউদ এর সবই অপছন্দ করতেন। এটা যে মুহূর্তে নুশরাহ্ কুরআন সম্বলিত তাবিজের মাধ্যমে হবে তাও তকা অপছন্দনীয় কিন্তু ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তাবিজ ছাড়া যদি নুশরাহ্ প্রয়োগ করা হয় তবে তাতে অপছন্দ করার কোন কারণ নেই। কেননা নবী (ﷺ) নিজে তা ব্যবহার করেছেন এবং অন্যকে অনুমতি দিয়েছেন।

হাসান (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদু নষ্ট করতে পারে না। নুশরাহ্ হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা।[২]

নুশরাহ্ দু'ধরনেরঃ

প্রথমটি হচ্ছেঃ যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা, আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রহঃ) এর বক্তব্য দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাশের (যাদুর চিকিৎসা) ও মুনতাশার (যাদুকৃত রোগী) উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঔষধ প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দু'আ ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা। এর ধরনের চিকিৎসা বৈধ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নুশরাহ্ (প্রতিরোধমূলক যাদু) এর উপর নিষেধাজ্ঞারোপ।

২। নিষিদ্ধ বস্তু ও অনুমতিপ্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকরণ, যাতে সন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়।

২। সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, 'একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমাধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (নুশরাহ্) এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা এর (নুশরাহ্) সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়। ইবনে মুসাইয়্যিব (ﷺ)এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নুশরাহ্ যখন দু'আ, ঝাড়-ফুঁক কুরআন দ্বারা হবে তখনই কেবল তা বৈধ হবে ; কিন্তু যখন তা যাদুর মাধ্যমে হবে তখন সেটাকে বৈধ বলা নিশ্চয়ই যাবে না। মোটকথা, যাদু কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যাদু বা শিরকি কালাম দ্বারা হবে তখন অবশ্য অবৈধ হবে, পক্ষান্তরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যদি শরীয়ত সমর্থিত ঝাড়-ফুঁক দ্বারা হয় তখন তা বৈধ হবে।

অধ্যায়-২৭
কুলক্ষণ* সম্পর্কীয় বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ "মনে রাখ তাদের অলক্ষণ ও যে আল্লাহ্রই ইলেমে রয়েছে অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না।"[১] (সূরা আরাফঃ ১৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ﴾

অর্থঃ "রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই রয়েছে।"[২] (সূরা ইয়াসীনঃ ১৯)

আবূ হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ»(صحيح البخاري، الطب، باب لا هامة، ح:٥٧٥٧ وصحيح مسلم، السلام، باب لا عدوٰى ولا طيرة ولا هامة

---

* কুলক্ষণ ধারণা পোষণ শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী তবে এটা ছোট শিরক, এটার উদাহরণ এরূপ যেমন পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দের নির্ণয় করা, অথবা কোন ঘটনা থেকে কুলক্ষণ নির্ণয় করা।

১। 'মনে রেখ আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। অর্থাৎ তাদের কাছে কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর ভাল-মন্দ যা কিছুই জুটে তা সবকিছুই তাকদীরের কারণে। যা আল্লাহ্র কাছে শিরধার্য। কুলক্ষণের ধারণা নবীদের চিরশত্রু পৌত্তলিকদের অন্যতম গুণাবলী ফলে এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে নবীদের অনুসারীগণ সবকিছুতেই তাদের ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করে যেমন আল্লাহ্ বলেন "নিশ্চয় তাদের কুলক্ষণ সমূহের চাবিকাঠি আল্লাহর কাছে" তাঁরা বলেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। সুতরাং কুলক্ষণ ধারণা মুশরিক ও রাসূলদের শত্রুদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

২। 'তিনি বলেন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য কথার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই।' কোন ব্যাধির সংক্রমিত হবার নিজস্ব ক্ষমতা নেই বরং আল্লাহর ইচ্ছায় কখনও কখনও সংক্রমিত হয়ে থাকে। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ ধারণা রাখত যে ব্যাধি নিজে নিজেই সংক্রমিত হয়ে থাকে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে আকিদাকে বাতিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পাখি উড়িয়ে যা কখনও কখনও হৃদয়ে উদয় হয় কিন্তু এটা কোনই প্রভাব পড়ে না।

ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ح:٢٢٢٠، زاد مسلم: "ولا نوء ولا غول")

"দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য, পেঁচার ডাক ও সফর মাসের কোন রহস্য নেই।" (বুখারী ও মুসলিম) [মুসলিমের হাদীসে 'নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই' এ কথাটুকু অতিরিক্ত আছে।]

বুখারী ও মুসলিমে আনাস (ﷺ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»(صحيح البخاري، الطب، باب لا عدوٰى، ح:٥٧٧٦ وصحيح مسلم، السلام، باب الطيرة والفأل ح:٢٢٢٤)

"ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে 'ফাল' আমার কাছে ভালো লাগে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাল' কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেনঃ 'উত্তম কথা'।[৩] [যে কথা শিরক মুক্ত]

উকবা বিন আমের (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল (ﷺ) এর দরবারে উল্লেখ করা হলো। জবাবে তিনি বললেনঃ এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে 'ফাল'। কুলক্ষণ কোনো মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলেঃ

«اَللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ»(سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الطيرة، ح:٣٩١٩)

৩। 'ফাল' তথা উত্তম কথা আল্লাহ্‌র সাথে ভাল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা প্রশংসিত কিন্তু কুলক্ষণ যেহেতু আল্লাহ্‌র সাথে খারাপ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ফলে কুলক্ষণ অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

"হে আল্লাহ্ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই।"[৪] (আবু দাউদ)

ইবনে মাসউদ (ﷺ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

«اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ...وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»(سنن أبي داود، الكهانة والطيرة، باب في التطير، ح:٣٩١٠ وجامع الترمذي، السير، باب ما جاء في الطيرة، ح:١٦١٤)

"পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শিরকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শিরকী কাজ,. একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন।"[৫] (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, 'কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো।[৬] সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দু'আ পড়বে–

«اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ»(مسند أحمد: ٢/ ٢٢٠)

৪। কুলক্ষণ কথা ও কাজের মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু উত্তম ধারণাই কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত। কেননা লক্ষণ শুভ মনে করা বক্ষকে প্রশস্ত করে সংকীর্ণতাকে দূর করে বান্দা যখন কোন কাজে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করে তখন তার অন্তর থেকে শয়তানি প্রভাব দূর হয়ে যায়।
উপরে বর্ণিত দু'আ 'হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই'। যার মাধ্যয়ে মনে উদয় হওয়া সকল প্রকার কুলক্ষণে অশুভ ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর মহান দু'আ।

৫। ইবনে মাসউদ (ﷺ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শিরকি কাজ, অর্থাৎ শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। সঠিকভাবে আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করার কাজগুলির মত শয়তানী চক্রান্ত দূর করে দেয়।

৬। 'কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা, যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো। হাদীসটি পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শিরক হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"হে আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোনো মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (আহমাদ)

ফজল বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

«إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»(مسند أحمد: ١/ ٢١٣)

"তিয়ারাহ্" অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোনো অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।" (আহমাদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। "জেনে রাখ তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহ্‌র কাছে নিহিত" (সূরা আরাফের ১৩১ ও সূরা ইয়াসীনের ১৯ নং আয়াত) এবং "তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে।" এ আয়াত দু'টির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২। সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩। কুলক্ষণের অস্বীকৃতি।

৪। পেঁচার ডাকে কোন রহস্য থাকার অস্বীকৃতী।

৫। কুলক্ষুণে 'সফর' এর অস্বীকৃতি স্থাপন (অর্থাৎ কুলক্ষুণে 'সফর মাস' বলতে কিছু নেই। জাহেলী যুগে সফর মাসকে কুলক্ষুণে মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

৬। 'ফাল' উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয় ; বরং এটা মোস্তাহাব।

৭। 'ফাল' এর ব্যাখ্যা।

৮। অনিচ্ছায় অন্তরে উদয় হওয়া কুলক্ষণের ধারণা সৃষ্টি হওয়া ক্ষতিকারক নয় বরং তা আল্লাহর উপর ভরসা করাতে দূর হয়ে যায়।

৯। যার অন্তরে কুলক্ষণের ধারণা উদয় হবে সে কি দোয়া পড়বে তার বর্ণনা।

১০। কুলক্ষণ শিরক হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা।

১১। নিন্দনীয় কুলক্ষণের তাফসীর।

অধ্যায়-২৮
জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান*

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেনঃ (১) আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, (২) আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং (৩) দিক ভুলা পথিকদের দিক নির্দেশনা হিসেবে পথে দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।[১]

কাতাদাহ (ﷺ) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উ'য়াইনা এ বিদ্যাঅর্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকেই 'হারব' (রহঃ) একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক (রহঃ) [চাঁদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।[২]

---

* জ্যোতির্বিদ্যার বিধান ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা তিন প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে ধারণা পোষণ করা যে তারকারাজি নিজেই ক্রিয়াশীল এবং পার্থিবজগতের যাবতীয় ঘটনাবলী নক্ষত্ররাজির ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে এবং এটা সর্বসম্মতি ক্রমে বড় ধরনের কুফরী এবং ইব্রাহীম (ﷺ) জাতির শিরকের ন্যায় শিরক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যাকে ইলমুত্তাছীর বলা হয়। আর তা হচ্ছে আকাশের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, নক্ষত্রের চলাচল সেগুলির মিলন, বিচ্ছেদ উদয় ও অস্ত থেকে যাবতীয় ঘটনাবলী প্রমাণ গ্রহণ করা। যিনি এ ধরনের কাজ করেন তাকে জ্যোতির্ষী বলা হয়। যা গণকের একটা অংশ। এদের কাছে শয়তান আগমন ঘটে এবং শয়তান তাদেরকে তাদের কথামত খবর প্রদান করে এটা সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহ্ ও আল্লাহ্‌র সাথে প্রকাশ্য কুফরী। জ্যোতির্বিদ্যার তৃতীয় হচ্ছে ইলমুত্তাসয়ীর সেটা হচ্ছে তারকারাজি ও তার চলাচল সম্পর্কে কেবলা নির্ধারণ, সময় নির্ধারণ এবং কৃষি কার্যের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। উক্ত প্রকার জ্যোতির্বিদ্যায় উলামায়ে কিরাম সম্মতি প্রদান করেছেন। ফলে উক্ত প্রকার জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও আলোচনায় কোন অসুবিধা নেই।

১। তারকারাজির সৃষ্টির তিনটি রহস্যই সঠিক, কেননা তারকারাজি ও আল্লাহর মাখলুক। সুতরাং আল্লাহ্ আমাদেরকে যা কিছু অবহিত করেছেন তাছাড়া অন্য কোন রহস্য আমাদের জানা নেই।

২। চন্দ্রের কক্ষপথ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন সঠিক, কেননা আল্লাহ তা'আলা সেটা উল্লেখ করে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি চন্দ্রকে নূর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যেন তোমরা বছর এবং হিসাব সম্পর্কে অবগত হতে পার।

আবু মূসা (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»(مسند أحمد: ٣٩٩/٤ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح: ١٣٨١)

"তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে নাঃ (১) মাদকাসক্ত ব্যক্তি, (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং (৩) যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।" (আহমাদ, ইবনু হিব্বান)[৩]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২। নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩। কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪। যাদু বাতিল জানা সত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসকেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি হুঁশিয়ারী।

৩। ইতিপূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে, জ্যোতির্বিদ্যা যাদুরই একটি প্রকার। যেমন নবী (ﷺ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার যতটুকু অংশ শিক্ষা করল সে যেন ঐ পরিমাণ যাদু শিক্ষা করল" (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)

মানুষের অজ্ঞাতসারে বর্তমানে স্পষ্টত জ্যোতির্বিদ্যায় যে ক্ষেত্রে মানুষ নিমজ্জিত হচ্ছে তা হলোঃ ব্যাপকভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত রাশিফল বা রাশিচক্র। এটি হলো তাসীরী জ্যোতির্বিদ্যা এবং তা হলো গণকদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এটিকে সার্বিকভাবে প্রতিহত করা অপরিহার্য। এ ধরনের পেপার পত্রিকা ঘরে উঠানো, পড়া ও তা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কেননা যে রাশিফল দেখল সে অবশ্যই যেন ইচ্ছাকৃতভাবে গণকের আশ্রয় গ্রহণ করল। অতএব, যে রাশি রাশিফল সম্বলিত পত্রিকা গ্রহণ করল ও পড়ল ও তার সেই রাশি সম্পর্কে জানল যাতে সে জন্মগ্রহণ করেছে বা তার উপযুক্ত রাশি নির্ণয় করল ও সে সম্পর্কে পড়ল তবে সে যেন গণকের নিকটই এসে সেগুলি সম্পর্কে জানল যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। অতএব, রাশিফলে সে যা পড়ে জানল তা যদি সত্য মনে করে তবে অবশ্যই সে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল। সুতরাং রাশিফল প্রয়োগকারীরা হলো, গণকদেরই অন্তর্ভুক্ত ও তাওহীদের পরিপন্থী।

অধ্যায়-২৯
নক্ষত্রের উসীলায় বৃষ্টি কামনা করা *

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾

অর্থঃ "তোমরা (নক্ষত্রের মাঝে) তোমাদের রিযিক নিহিত আছে মনে কর নিশ্চয়ই তোমরা (আল্লাহ্র নেয়ামতকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো।"[১] (সূরা ওয়াকেয়াহ্ঃ ৮২)

আবু মালেক আশআরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: اَلْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ: اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ، وَّدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ»(صحيح مسلم، الجنائز، باب التشديد في النياحة، ح: ٩٣٤ ومسند أحمد: ٥/ ٣٤٢، ٣٤٤)

"জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব[২] আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে,

---

* অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হিসেবে নক্ষত্রের উল্লেখ করা এটা সম্পূর্ণ তাওহীদ পরিপন্থী। সমস্ত নিয়ামত একমাত্র আল্লাহর দিকে সম্বোধন করাতেই তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে এবং যেন নিয়ামতের কোন অংশই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দিকে সম্বোধন না করা হয়। যদিও সেখানে কেউ উক্ত নিয়ামতের কারণ বা মাধ্যমও হয়। এর ফলে দুইভাবে সীমালজ্ঘন ঘটে থাকেঃ (১) নক্ষত্র বৃষ্টি বর্ষনের কারণ নয়। (২) বৃষ্টি বর্ষনের জন্য কারণ সাব্যস্ত করা যাকে আল্লাহ তায়ালা কারণ সাব্যস্ত করেননি। অথচ নিয়ামত, অনুগ্রহ ও বৃষ্টি বর্ষনের সম্পর্ক নক্ষত্রের দিকে করা।

১। 'তোমরা (নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের) রিযিক নিহিত আছে মনে করে আল্লাহ্র নিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো।' তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন যে আল্লাহ্র ব্যাপারে অত্র নিয়ামতকে অন্যের দিকে সম্বোধন করার ব্যাপারে অত্র আয়াতে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

২। 'জাহেলী যুগের কুস্বভাবগুলি অত্যন্ত নিন্দনীয়। সহীহ্ বুখারীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী (ﷺ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে ক্রোধের ব্যক্তি তিন প্রকারের লোক তন্মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি যে ইসলামে জাহেলী যুগের প্রথা অন্বেষণ করে।" আভিজাত্যের অহংকার করাঃ অর্থাৎ স্বীয় বংশের গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা। বংশের বদনাম করাঃ অর্থাৎ

যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। (১) আভিজাত্যের অহংকার করা। (২) বংশের বদনাম গাওয়া। (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং (৪) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি আরো বলেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিনী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে।" মুসলিম

ইমাম বুখারী ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»(صحيح البخاري، الاستسقاء، باب قوله تعالى ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ ح:١٠٣٨

وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ح:٧١)

"রাসূল (ﷺ) হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। নামাযান্তে রাসূল (ﷺ) লোকদেরকে ফিরে বলতে লাগলেন, "তোমাদের কি জানা আছে তোমাদের প্রভু কি বলেছেন?

তাচ্ছিল্যসহ এ ধরনের কথা যে অমুক তো ঐ বংশের অথবা দলীল বিহীন ও বিনা প্রয়োজনেই কারো বংশ অস্বীকার করা ও তাকে অন্যায় ভাবা। নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করাঃ অর্থাৎ, বিশ্বাস করা যে নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়, বা এর চেয়েও যা ভয়াবহ তা হলো নক্ষত্রের নিকট বৃষ্টি কামনা করা। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করাঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী যদি তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের জামা পরানো হবে। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা কবীরা গুনাহ। বিপদের সময় চিৎকার করে কান্নাকাটি করা এবং বুকের কাপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি করা, যা সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের পরিপন্থী এবং জাহেলী যুগের প্রথার অনুরূপ।

লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।'[৩] তিনি বললেন, 'আল্লাহ পাক বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে রাত্রি অতিবাহিত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে।'[৪] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের 'উসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।"[৫]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, 'অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ○ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ○ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ○ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ○ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ○ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ○ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ○ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾

অর্থঃ " আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে, নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতারিত। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো।" (সূরা ওয়াকিয়াহ্ঃ ৭৫-৮৬)

৩। 'লোকেরা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' এ কথা শুনামাত্র রাসূল (ﷺ) এর জীবদ্দশাতেই বলা হতো ; কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পর যদি কাউকে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যা তার জানা নেই তবে সে যেন বলে আল্লাহই ভাল জানেন।

৪। 'সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। কেননা সে নিয়ামতকে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে সম্বোধন করেছে যা তার ঈমানের প্রমাণ করে।

৫। যে ব্যক্তি বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের 'উসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।' নক্ষত্রকে যদি বৃষ্টির কারণ হিসেবে মনে করে তবে সেটা ছোট কুফরী হবে। কিন্তু যদি মনে করে যে নক্ষত্রই বৃষ্টিবর্ষণ করেছে এবং মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন তখন সেটা ভয়াবহ কুফরী হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়ার উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একেবারে বের করে দিবে না।

৫। 'বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাযিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৭। এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি? কোনো বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে এরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

১০। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনীর জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

অধ্যায়-৩০

আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসা দ্বীনের স্তম্ভ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾

অর্থঃ "আর কোন লোক এমন রয়েছে যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে যেমন আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে।"* (সূরা বাকারাহ্ঃ ১৬৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ﴾

অর্থঃ "বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও তার রাহে জিহাদ করা

---

* এখানে গ্রন্থকার (রহঃ) আন্তরিক ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছেন এবং এককভাবে আল্লাহর জন্য অন্তর্গত ইবাদত করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এটা তাওহীদের অতীব জরুরী একটা বিষয় ও তাওহীদের পরিপূর্ণতা দানকারী। বান্দার নিকট আল্লাহই যেন সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হয় এমন কি নিজের অন্তরের চেয়ে। এখানে মুহাব্বত বলতে ইবাদতের মুহাব্বত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ তার প্রিয়তম আল্লাহর সাথে এমন গভীর সম্পর্ক রাখবে এবং তাঁর সাথে এমন মুহাব্বত হবে যে সে আনন্দচিত্তে তার সমস্ত হুকুমকে পালন করবে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। যখনই তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাথে করা হবে তখন তা শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকে রূপান্তরিত হবে। এই মুহাব্বাতই দ্বীনের স্তম্ভ এবং অন্তরের সঠিকতার ভিত্তি।

থেকে বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত।”[১] (সূরা তাওবাঃ ২৪)

আনাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ»(صحيح البخاري، الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، ح:١٥ وصحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، ح:٤٤)

“তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।”[২] (বুখারী ও মুসলিম)

আনাস (ﷺ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ، أَنْ يَّكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّهِ، وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ»(صحيح البخاري، الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ح:١٦،

১। ‘হে রাসূল আপনি বলে দিন যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন ...। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ধমক দিয়েছেন এবং এখানে এ কথা প্রমাণিত যে আল্লাহ্‌র মুহাব্বাতের উপর অন্য কারো মুহাব্বাতকে প্রাধান্য দেয়া কবিরা গুনাহ ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাওহীদকে পূর্ণতা দিতে হলে প্রত্যেক প্রিয়তমের চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালবাসা দিতে হবে এবং নবী (ﷺ) এর প্রতি মুহাব্বাত আল্লাহর পথে মুহাব্বাত, আল্লাহর সাথে নয় কেননা তিনি আমাদেরকে রাসূল (ﷺ)কে ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

২। অর্থাৎ, আমার প্রিয় বিষয়গুলিকে অন্যের প্রিয় বিষয়বস্তুর চেয়ে এরূপ অগ্রাধিকার দিতে হবে যে, তার অন্তরে আমার মুহাব্বত তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত লোকের মুহাব্বত থেকে বেশি হয়। অবশ্য এ মুহাব্বত প্রকাশ পাবে কর্মের মাধ্যমে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ইবাদতের ভালবাসা বেশে থাকে তবে সে আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা চালাবে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার যথা সম্ভব চেষ্টা করবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর সাথে প্রকৃত মুহাব্বত রাখে সেও প্রকৃত পক্ষে উক্ত নীতি অবলম্বন করবে।

٢١، ١٩٤١ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ح:٤٣)

"যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। (১) তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া। (২) একমাত্র আল্লাহ্ পাকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য কোনো ব্যক্তিকে ভালবাসা। (৩) আল্লাহ্ পাক তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।"

অন্য বর্ণনায় আছে–

«لاَ تَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى . . . » (صحيح البخاري، الأدب، باب الحب في الله، ح:٦٠٤١)

"কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না...।" (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।[৩]

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

«مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَأَنَّمَا تُـنَالُ وَلاَيَةُ اللهِ بِذٰلِكَ وَلَنْ يَّجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذٰلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذٰلِكَ لاَ يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا»

(رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، ح:٣٥٣ وابن أبي شيبة في المصنف بالشطر الأول فقط، ح:٣٤٧٥٩ وأخرجه الطبراني أيضا موقوفا على ابن عمر في المعجم الكبير: ١٢/١٣٥٣٧)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা পোষণ

৩। ঈমানেরও এক মধুর স্বাদ রয়েছে যা আত্মা দিয়ে অনুভব করা যায়।

করে ; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বন্ধুত্ব লাভ করবে।[৪] আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত নামায রোজার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, কোনো বান্দাহই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।"

সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোনো উপকার সাধিত হয় না। (ইবনে জারীর)

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ

﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾

অর্থঃ "তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"[৫] (সূরা বাকারাঃ ১৬৬) এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক।

৪। ভালবাসার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ওয়ালীতে পরিণত হয়। (ওয়ালী) বেলায়ত এর অর্থ হলো, মুহাব্বাত ও সাহায্য।

৫। 'তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।' কেননা মুশরিকগণ তাদের উপাস্যদের সাথে শিরক করত ও তাদেরকে ভালবাসত এবং ধারণা করত যে এরা তাদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে ; কিন্তু তাদের সকল ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা বাকারার ১৬৫ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ২৪নং আয়াতের তাফসীর।

৩। রাসূল (ﷺ) এর প্রতি ভালবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪। কোনো কোনো বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যেতে পারে]।

৫। ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

৬। অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহ্ পাকের বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদ ও অনুভব করা যায় না।

৭। একজন (জলীলুল কদর) সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণতঃ গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮। ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ এর তাফসীর।

৯। মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্কে খুব ভালবাসে। [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালবাসা অর্থহীন।

১০। সূরা তাওবার উক্ত আয়াতে উল্লিখিত আটটি জিনিসের ভালবাসা যার অন্তরে স্বীয় দ্বীনের চেয়েও বেশি, তার প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

১১। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সাথে কাউকে শরীক করে এবং ঐ শরীককে আল্লাহ্ পাককে ভালবাসার মতই ভালবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরণের শিরক করলো।

অধ্যায়-৩১

ভয়ভীতি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

অর্থঃ "এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে আমাকে ভয় কর।"* (সূরা আল-ইমরানঃ ১৭৫)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায,

---

* অত্র অধ্যায় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা ইবদতের অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে, যা আন্তরিক অপরিহার্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং সেটার পূর্ণতা তাওহীদের পূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা তাওহীদের অসম্পূর্ণতা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ভয় করা তিন প্রকারের, প্রথমটি শিরক, দ্বিতীয়টি হারাম এবং তৃতীয়টি বৈধ।

(এক) যে ভয় শিরকঃ এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, অমুক ব্যক্তি, তিনি নবী হোন, অলী হোন আর জিন হোন গোপণে তার ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা রাখে এটা দুনিয়ার ব্যাপারে হোক কিংবা পরকালের ব্যাপারেঃ পরকালের ক্ষেত্রে শিরকী ভয় হলঃ কারো এ ধরনের ভয় করা যে, উক্ত অলীরা সম্মানিত ব্যক্তি পরকালে তার উপকার করবে, সুপারিশ করবে পরকালে তার নৈকট্য লাভ করতে পারবে, আযাব দূর করবে, তাই তাকে ভয় করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে।

(দুই) নিষিদ্ধ ভয়ঃ কারো প্রতি ভয়ের কারণে আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়ন হতে বিরত থাকা।

(তিন) প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ভয়ঃ যেমন শত্রু থেকে ভয়, হিংস্র প্রাণী থেকে ভয়, আগুন থেকে ভয় ইত্যাদি। আল্লাহর বানীঃ "তোমরা আমাকে ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হও।" ভয় করার নির্দেশ প্রদান এ কথাই প্রমাণ করে যে ভয় একটি ইবাদত।

আদায় করেছে যাকাত এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।"[১] (সূরা তাওবাঃ ১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থঃ "কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয় তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে।"[২] (সূরা আনকাবূতঃ ১০)

আবূ সাঈদ (رضي الله عنه) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

«إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لاَ يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَّلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ»(شعب الإيمان، الخامس من شعب الإيمان، وهو باب في أن القدر...، ح:٢٠٧)

"ঈমানের দূর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ্ পাককে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্ট করা, আল্লাহ্ পাকের রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ্ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোনো লোভীর লোভ আল্লাহ্ পাকের রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোনো ঘৃণাকারীর ঘৃণা আল্লাহ্ পাকের রিযিক বন্ধ করতে পারে না।"[৩]

১। "একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা" অত্র আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ভয় একমাত্র আল্লাহ্কেই করতে হবে এবং যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করেন তিনি তাদের এখানে প্রশংসা করেছেন।

২। 'মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহ্র আযাবের সমতুল্য মনে করে।' অর্থাৎ সে পরীক্ষাকে ভয় পায় এবং তার প্রতি আল্লাহ্র বিধান যেটা ওয়াজিব সেটা ছেড়ে দেয় অথবা মানুষের কথার ভয়ে গর্হিত কাজ করে ফেলে।

৩। যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়...। এটা ঈমানের দূর্বলতা এবং হারাম কাজগুলি ঈমানকে দূর্বল করে ফেলে কেননা ঈমান আনুগত্যের মাধ্যমে বর্ধিত হয় এবং পাপের

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح:١٥٤١-١٥٤٢ وجامع الترمذي، ح:٢٤١٤ وله ألفاظ أخرى)

"যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ পাকও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।"[8] (ইবনে হিব্বান)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা আলে-ইমরানের ১৭৫নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ১৮নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা আনকাবূতের ১০নং আয়াতের তাফসীর।

৪। ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দূর্বল হওয়া সংক্রান্ত কথা।

৫। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয় ঈমানের দূর্বলতার আলামত।

৬। ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহ্ পাককে ভয় করা ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

৭। আল্লাহকে যে ভয় করে তার জন্য সওয়াবের উল্লেখ।

৮। অন্তর থেকে আল্লাহ্ পাকের ভয় পরিত্যাগকারীর জন্য শাস্তির উল্লেখ।

কারণে ঈমান হ্রাস পায় এবং অত্র আলোচনা থেকে এও প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্টি রেখে মানুষকে খুশি করা যেমন পাপ তেমনি হারাম।

৪। এ হলো যারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে তার প্রতিদান এবং যে এ ভয়মূলক ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদপূর্ণ করবেনা তার প্রতিদান, কেননা সে মানুষকে ভয় করে পাপে পতিত হয়েছে এবং সে মানুষ থেকে ভয় করাকে হারামে লিপ্ত হওয়ার ও ফরয কাজ পরিত্যাগ করার কারণ বানিয়েছে।

অধ্যায়-৩২
একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

অর্থঃ "আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"* (সূরা মায়েদাঃ ২৩)

---

* আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা নির্ভেজাল ইসলামের শর্ত। সে কথাই অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করার শরয়ী মর্মার্থ হচ্ছে এটা একটি বিরাট মানের আন্তরিক ইবাদত, বান্দা তার সামগ্রিক কাজে আল্লাহ্‌র উপর আস্থাশীল থাকবে এবং সবকিছুকেই তার উপর সোর্পদ করবে ও সাথে সাথে কারণগুলি নিজে সম্পাদন করবে। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসাকারী ঐ ব্যক্তি যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করার পর উক্ত ব্যাপারকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে দিবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে, এ কারণে উপকার সাধন আল্লাহরই হুকুমে হতে পারে আর যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করা হয়েছে সবকিছুই তার সাহায্য ও তাওফীকেই হয়ে থাকে। অতএব, নিছক আন্তরিক ইবাদত হলো তাওয়াক্কুল।

গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করা দুই প্রকারঃ প্রথমটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি এমন কোন মাখ্লুক তথা সৃষ্টি জীবের উপর এমন বিষয়ে ভরসা বা আস্থা রাখে যার উপর সে ক্ষমতা রাখে না বরং আল্লাহ্ই সে ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। যেমন- পাপ মার্জনা করা অথবা সন্তান দান করা, অথবা ভাল চাকরি প্রদান করা। এগুলো সচরাচর কবর পূজকদের মাঝে দেখা যায়। এটা মূলতঃ শিরকে আকবার বা বড় শিরক যা তাওহীদ পরিপন্থী। **দ্বিতীয়টি** হচ্ছে কোন বক্তি এমন কোন মাখলুকের উপর এমন বিষয়ে ভরসা করে যার উপর সে ক্ষমতা রাখে। এটা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। যেমন- কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি, তোমার উপরও। এমনকি একথাও বলা জায়েয হবে না যে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি অতঃপর তোমার উপর, কেন না তাওয়াক্কুল এমন একটি বিষয় যেখানে কোন মাখলুকের কোন অংশ নেই। আর তাওয়াক্কুল বা ভরসার প্রকৃত অর্থ তো ইতোপূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে তাওয়াক্কুলের মর্ম হলো, স্বীয় কার্যাবলী আল্লাহরই দিকে সোপর্দ করা যার হাতেই রয়েছে সমস্ত কিছুর অধিকার মাখলুকের নিকট কোন অধিকার বা সামর্থ নেই। তবে মাখলুক কারণ হতে পারে। অতএব এর অর্থ এ নয় যে কোন মাখলুকের উপর ভরসা করা যাবে।

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ ﴾ এটিই প্রমাণ করে যে, এর পূর্বে আসার অর্থই হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা ওয়াজিব এবং যেহেতু তাওয়াক্কুল একটি ইবাদত সুতরাং তা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হবে। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন 'যদি তোমরা মুমিন হও সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে এককভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করলে ঈমান সঠিক হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

অর্থঃ "যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর।"[১] (সূরা আনফালঃ ২)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থঃ "হে নবী (ﷺ)! তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্যে (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾

অর্থঃ "আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দিবেন।"[২] (সূরা তালাকঃ ৩)

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾

অর্থঃ "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৭৩)

১। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, -------- অর্থাৎ ------ কে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ মুমিনগণ শুধুমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে। সুতরাং এটা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। অর্থাৎ হে নবী তোমার ও তোমার অনুসারী মুমিনদের ভরসার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট অন্যের উপর ভরসা করার প্রয়োজন নেই। এজন্যে অন্য এক আয়াতও তারপর বর্ণনা করেন, ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ তাওয়াক্কুল তখনই পুরোপুরি বুঝা সম্ভব হবে যখন তাওহীদে রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকবে। কেননা যখন কেউ জানবে আল্লাহ্ই এই বিশাল ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণ্ডলের একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনি সর্বময় ক্ষতার অধিকারী তখন তাওয়াক্কুল বা ভরসা আরও দৃঢ় হবে।

এ কথা ইব্‌রাহীম (ﷺ) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আর মুহাম্মাদ (ﷺ) এ কথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলোঃ

﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾

অর্থঃ "তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদের ভয় কর, তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায়।"[৩] (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৭৩) [বুখারী ও নাসাঈ]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌ পাকের উপর ভরসা করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত।

২। আল্লাহ্‌ পাকের উপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।

৩। সূরা আনফালের ২ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। আয়াতটির তাফসীর এর শেষাংশেই রয়েছে।

৫। সূরা তালাকের ৩নং আয়াতের তাফসীর।

৬। حسبنا الله কথাটি ইব্‌রাহীম (ﷺ) ও মুহাম্মাদ (ﷺ) বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

৩। حسبنا الله এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি মহান বাণী। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র উপর পুরো আস্থা রাখবে তখন আল্লাহ্‌ তার সহায় হবেন যদিও আসমান ও জমিন সমপরিমাণ তার উপর বিপদ থাক না কেন, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তার পথ তৈরি করে দিবেন।

অধ্যায়-৩৩

আল্লাহ্ তায়ালার পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾

অর্থঃ "তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিত হতে পারে যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।"* (সূরা আল-'আরাফঃ ৯৯)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾

অর্থঃ "তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়।"[১] (সূরা হিজরঃ ৫৬)

---

* অত্র অধ্যায়ে দুটি আয়াতের উল্লেখ আছে এবং আয়াত দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। প্রথমত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের স্বভাব হলো যে তারা আল্লাহ্‌র শাস্তির পাকড়াও থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে না আর আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা ভয় না পাওয়া ও ভয়-ভীতির ইবাদত পরিহার করারই ফল। অথচ ভয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তরিক ইবাদত। আয়াতে উল্লেখিত "মকর" কৌশল অবলম্বনের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্য যাবতীয় কাজ এমন সহজ করে দেন যে, সে এমন ধারণা করে ফেলে যে সে বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, তার আর কোন ভয় নেই। প্রকৃত পক্ষে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে অবকাশ দেয়া। আল্লাহ্ মানুষকে সবকিছুই দেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে নিরাপদে রয়েছে। এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "যখন তোমরা দেখবে যে আল্লাহ্ কোন বান্দাকে শুধু দিয়েছেন অথচ সে সদা-পাপ কাজে লিপ্ত, তবে তোমরা জেনে রাখো যে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে অবকাশ দিচ্ছেন।" আল্লাহ তায়ালা এ কৌশল অবলম্বন তাদের সাথেই করে থাকেন যারা তাঁর নবী, অলীদের ও তাঁর দ্বীনের সাথে গোপনে চক্রান্ত ও ধোকাবাজির আশ্রয় নেই। এ কৌশল অবলম্বন আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলী। কেননা এ সময় তিনি স্বীয় ইজ্জত, কুদরত ও প্রভাব প্রকাশ করেন।

১। এখানে আল্লাহ্ পথভ্রষ্টদের স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যে তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত থেকে নিরাশ ও উদাসীন। মোটকথা মুত্তাকিন এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের গুণাবলী হচ্ছে যে তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না অথচ আল্লাহ্‌কে তারা ভয়ও করে। 'আল্লাহ্‌কে ভয় করা বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভয়ভীতি এ উভয় গুণের মাধ্যমে বান্দাহ

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার উত্তরে বলেন, কবীরা গুনাহ্ হলোঃ

«اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ»(مسند البزار، ح:١٠٦ ومجمع الزوائد:١/ ١٠٤)

"আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করা, আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্ পাকের পাকড়াও থেকে নির্ভয় হওয়া।"[২]

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেছেনঃ

«أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ»(مصنف عبدالرزاق:١٠/ ٤٥٩ ومعجم الكبير للطبراني، ح:٨٧٨٣)

"সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হলোঃ আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করা, আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে নির্ভিক হওয়া, আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্ পাকের করুণা থেকে বঞ্চিত মনে করা।"[৩]

আল্লাহর ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা থাকা ওয়াজিব। তবে অন্তরে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খার মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে?

শারীরিক সুস্থ্য পাপীর জন্য ভয়-ভীতির দিক আশা-আকাঙ্খার চেয়ে প্রাধান্য পায়, আর মৃত্যুর সম্মুখীন অসুস্থের মধ্যে আশা-আকাঙ্খার দিক প্রাধান্য পায়। তবে সঠিক ও কল্যাণের পথে ধাবমান অবস্থায় ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। যেমনঃ আল্লাহর বাণী–

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴾

অর্থঃ "তারা নেকীর কাজে দ্রুতগামী এবং আমাকে তারা আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে আহ্বান (ইবাদত) করে ও আমাকেই তারা ভয় করতে থাকে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯০)

২। আল্লাহ্র রহমত থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষার ইবাদত পরিত্যাগ করা হলো নিরাশ হওয়া আর আল্লাহর ভয়-ভীতির ইবাদত ত্যাগ করা হলো তাঁর শাস্তি থেকে নির্ভিক হওয়া। অতএব, উভয়টি বান্দার অন্তরে একত্রিত হওয়া ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত আর উভয়টি বান্দার অন্তর থেকে বিদায় হওয়া বা হ্রাস পাওয়া হলো পরিপূর্ণ তাওহীদের হ্রাস পাওয়া।

৩। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া অধিকাংশ লোকের মধ্যে বিদ্যমান। রহমত আল্লাহর নেয়ামত-অনুগ্রহসমূহ অর্জন ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর হাদীসে বর্ণিত শব্দ "রাওহ" দ্বারা উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়াই নেয়া হয়ে থাকে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়।

১। সূরা ‘আরাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা হিজরের ৫৬নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আল্লাহ্ পাকের পাকড়াও থেকে নির্ভিক ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির বিধানের কথা।

৪। আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩৪
তাকদীরের [ফায়সালার] উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ*

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ

﴿ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ﴾

অর্থঃ "এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা আত্-তাগাবুনঃ ১১)

আলকামা (ﷺ) বলেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন, যে বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে সে বিপদগ্রস্ত হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই বরণ করে নেয়।[১]

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، ح:٦٧، ومسند أحمد:٢/ ٣٧٧، ٤٤١، ٤٩٦)

---

* তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ ঈমানের অঙ্গ এবং এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সকল নির্দেশনাবলী পালনে ধৈর্যের প্রয়োজন হয় ; তেমন– সকল নিষেধাবলীতেও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তেমনি জাগতিক বিষয়ে তাকদীরের উপরও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। অতএব ধৈর্যের তিন প্রকার হলোঃ জিহ্বাকে শেকায়েত, দোষারূপ করা থেকে বিরত রাখা, মনকে নারাজ হওয়া থেকে বিরত রাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা।

১। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে হেদায়েত দান করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে আল্লাহ তাকে ইবাদতের উপর ধৈর্যধারণের ও ভাগ্যের উপর ক্রোধ হওয়া থেকে বিরত রাখবেন। বিপদাপদে পতিত হওয়া তাকদীরেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তাকদীর আল্লাহর হিকমতের উপরে হয় এবং আল্লাহর হিকমতের দাবীই হলো, প্রত্যেক কাজকে তার উপযুক্ত ও ভাল স্থানেই স্থাপন করা। যখন কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটবে তার মঙ্গল হবে যেন সে ধৈর্যধারণ করে। কিন্তু যদি সে ক্রোধ প্রকাশ করে তবে তাতে তার পাপ হবে।

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি [খারাপ] স্বভাব রয়েছে, যার দ্বারা তার কুফরী প্রকাশ পায়।[২] তার একটি হচ্ছে বংশ উল্লেখ করে খোটা দেয়া, আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।"

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনে মাসউদ (ﷺ) হতে মারফু হাদীসে বর্ণনা করেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»(صحيح البخاري، الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، ح:١٢٩٧ وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، ح:١٠٣ ومسند أحمد:١/٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢)

"যে ব্যক্তি শোকের সময় চেহারাতে মারে, গলাবন্ধ ফাড়ে-চিরে ও জাহেলী প্রথার ন্যায় আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৩]

আনাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(جامع الترمذي، الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح:٢٣٩٦)

"আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন অতি

২। দুটি কুফরী স্বভাব এমন যা অধিকাংশ লোকের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং তা অবশিষ্ট থাকবেঃ (১) বংশের খোটা দেয়া এবং (২) মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। মৃতের জন্য বিলাপ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। অথচ সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধৈর্য হলোঃ চেহারাতে মারা, বুক চাপড়ানো ইত্যদি থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা। মুখ দ্বারা আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা থেকে বিরত থাকা।

উক্ত স্বভাব কুফরী হওয়ার অর্থ এ নয়, যে এগুলি করল সে এমন কাফের হয়ে গেল যে মিল্লাত থেকে একেবারে বেরিয়ে গেল বরং যে এ সমস্ত কর্মে লিপ্ত হলো সে কুফরীর একটি স্বভাবে লিপ্ত হলো ও কুফরের একটি অংশে পতিত হলো।

৩। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা ও উল্লেখিত কাজগুলি করা সবই কবীরা গুনাহ্ ফলে আমরা বলব ধৈর্য ত্যাগ করা ক্রোধ প্রকাশ করা কবীরা গুনাহ। যে কোন পাপ ঈমানের ঘাটতি যায় এবং ঈমান অনুগত্যের মাধ্যমে বর্ধিত হয় পাপের কারণে ঈমান হ্রাস পায় আর ঈমান হ্রাস পেলে তাওহীদও হ্রাস পাবে। বরং ধৈর্য পরিত্যাগ করা হলো, আবশ্যকীয় পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী হাদীসে বর্ণিত "আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" অর্থ উক্ত কর্মগুলি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্রুত দুনিয়াতেই তার [অপরাধের] শাস্তি প্রদান করেন।[৪] পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ কামনা করেন, তখন দুনিয়াতে তার অপরাধের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি দিতে পারেন।"

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»(جامع الترمذي، الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح:٢٣٩٦)

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতিকে ভালবাসেন, সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যারা সন্তুষ্ট থাকেন, তাদের উপর আল্লাহ্ও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যারা অসন্তুষ্ট হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট থাকেন।" (তিরমিযী)

৪। উক্ত হাদীসে আল্লাহর এক বড় হিকমতের বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ হিকমত যখন বান্দার মাথায় ধরবে তখন সে ধৈর্যকে এক মহা আন্তরিক ইবাদত জ্ঞান করে নিজে সে গুণে গুণান্বিত হবে এবং আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করতঃ অসন্তুষ্টিকে বর্জন করবে। অনেক সালফে সালেহীন বিপদে ও কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত না হলে নিজেদের উপর শেকায়েত করতেন যে হয়ত আমার পাপ বেশি হয়ে গেছে বলে আল্লাহ্ কোন বিপদ দিচ্ছেন না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা তাগাবুন এর ১১নং আয়াতের তাফসীর।

২। বিপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহ্‌র ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।

৩। কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্ণাম করা কুফরীর শামিল।

৪। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল-চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোনো রীতি-নীতির প্রতি আহ্বান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তি বিধানের কথা।

৫। বান্দার মঙ্গলের প্রতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিদর্শন।

৬। বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অমঙ্গলেচ্ছার নির্দশন।

৭। বান্দাহর প্রতি আল্লাহ্‌র ভালবাসার নির্দশন।

৮। আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯। বিপদে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকার ফজিলত।

অধ্যায়-৩৫

রিয়া* (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴾

অর্থঃ "তুমি বলঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদই একমাত্র মা'বূদ; সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।"[১] (সূরা কাহাফঃ ১১০)

আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب الرياء، ح: ٢٩٨٥)

"আমি অংশীদারদের শিরক (অর্থাৎ অংশীদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি [ঐ] ব্যক্তিকে এবং শিরককে তথা অংশীদারকে ও অংশীদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করি।"[২] মুসলিম

---

* রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদতের কঠোরতা সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। "রিয়া" চোখ দ্বারা দেখা অর্থে অর্থাৎ মানুষ কোন নেকীর কাজ করার সময় এমন ইচ্ছা করবে যে তাকে লোক এমতাবস্থায় যেন দেখে এবং তার প্রশংসা করে। রিয়া দুই প্রকারঃ **প্রথমটি** হচ্ছে মুনাফেকদের রিয়া, যেমন তারা মনের ভেতরে কুফর গোপন রেখে ইসলাম প্রকাশ করে শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য এটা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বড় ধরনের কুফুরী। **দ্বিতীয়** রিয়া হচ্ছে যে কোন মুসলমান তার কিছু আমল সম্পাদন করবে কিন্তু উদ্দেশ্য হবে লোক দেখানো এটাও শিরক তবে তা ছোট ধরনের শিরক এবং তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

১। উক্ত আয়াতে সব ধরনের শিরকের নাকচ করা হয়েছে। লোক দেখানো বা লোক শুনানো সকল প্রকার ইবাদত ও শিরকের আওতায় পড়বে।

২। এ হাদীস রিয়া মিশ্রিত আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণ না হওয়ার দলীল বরং তা আমলকারীর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। যদি কোন ইবাদত শুরু থেকেই রিয়া অর্থাৎ দেখানোর জন্য হয় তবে সমস্ত ইবাদতই বাতিল গণ্য হয় আর সে আমলকারী দেখানোর জন্য গুনাহগার হয়ে থাকে এবং

আবু সাঈদ (ﷺ) থেকে অন্য এক 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلٰى يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: الشِّـرْكُ الْخَفِيُّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلٰوتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَّظَرِ رَجُلٍ»(مسند أحمد:٣/ ٣٠ وسنن ابن ماجه، الزهد، باب الرياء والسمعة، ح:٤٢٠٤)

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে 'মসীহ দাজ্জালের' চেয়েও ভয়ঙ্কর?'[৩] সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে শিরকে খফী বা গুপ্ত শিরক। [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার নামাযকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোনো মানুষ তার নামায দেখছে [বলে সে মনে করছে]।" আহমাদ

ছোট শিরকে পতিত হয়। তবে যদি মূল ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে ; কিন্তু আমলকারী তাতে রিয়া মিশ্রণ করে ফেলে অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি ফরয নামায আদায় করতে এসে নামযের রুকু, সিজদাহ লম্বা করে, তাসবীহ বেশি বেশি পড়ে তবে এর ফলে উক্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে এবং তার ততটুকু ইবাদত বাতিল হবে যতটুকুতে সে রিয়া মিশ্রন করেছে। এতো দৈহিক ইবাদতের অবস্থা। আর যদি আর্থিক ইবাদত হয় তবে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। أشرك معي فيـه غـيري অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্যকেও অন্তর্ভুক্ত করলো।" এমন ইবাদতের অর্থ হলো যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় সৎ আমলে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে অন্যের ও সন্তুষ্টির আশাধারী হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত। তিনি তো শুধু এমন আমলই কবুল করে থাকেন যা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে।

৩। রিয়া দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকেও মারাত্মক তার কারণ হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট সে ব্যাপারে নবী (ﷺ) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু রিয়া মানুষের মনকে আক্রান্ত করে যা সংরক্ষণ অতীব কঠিন আর তা মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে মানুষের দিকে ধাবিত করে। ফলে নবী (ﷺ) এটাকে দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকে বেশি ভয়াবহতা বলে উল্লেখ করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ্ ছাড়াও অন্যকে খুশী করার নিয়তের মানসিকতা।

৩। এর [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এজন্য গাইরুল্লাহ্ মিশ্রিত কোনো আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪। আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ পাকের সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্ বহু গুণে উত্তম।

৫। রাসূল (ﷺ) এর অন্তরে রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উপর ভয় ও আশংকা।

৬। রাসূল (ﷺ) রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলতঃ নামায আদায় করবে আল্লাহ্‌রই জন্যে। তবে নামাযকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোনো মানুষ তার নামায দেখছে।

অধ্যায়-৩৬

নিছক পার্থিব স্বার্থে কোনো কাজ করা শিরক*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থঃ "যারা শুধু পার্থিব জীবন ও ওর জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলি (-র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্যে আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখিরাতে অকেজো হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।"[১] (সূরা হূদঃ ১৫-১৬)

---

* নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরকে আসগার তথা ছোট শিরক।

১। অত্র আয়াতে কারীমা যদিও কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ কিন্তু আয়াতের ভাবার্থ দ্বারা বুঝা যায় যে যারাই তাদের 'আমাল দ্বারা দুনিয়া অর্জন করতে চাইবে তারাও এই হুকুমের আওতায় পড়বে।

বান্দা যে সমস্ত কাজ দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে করে তা দু'প্রকারঃ প্রথমটি শুধু দুনিয়া অর্জনের জন্যেই কোন আমল সম্পাদন করা এবং পরকালের উদ্দেশ্যে না করা। যেমন- নামায, রোজা ইত্যাদি আমল শুধু দুনিয়ার স্বার্থে সম্পাদন করা তবে উক্ত ব্যক্তি মুশরিক বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় প্রকার যে কাজগুলোর ব্যাপারে শরীয়ত উৎসাহ প্রদান করেছে যেমন আত্মীয়তা রক্ষা করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ইত্যাদি, যখন এরূপ কাজ শুধু মাত্র দুনিয়ার লক্ষ্যেই করা হবে ; বরং আখিরাতের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না তখনও তা শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু যখন দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই উদ্দেশ্য হবে সেটা বৈধ বলে গণ্য হবে। অত্র আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি মাল উপার্জনের লক্ষ্যে সৎ কাজ করে সেও অত্র বিধানের আওতায় পড়বে; যেমন কেউ যদি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে শুধু চাকুরীর জন্য এবং দুনিয়ার সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য, তার উদ্দেশ্য এ নয় যে সে এ বিদ্যার মাধ্যমে নিজের অজ্ঞতা দূর করবে এবং জান্নাত লাভ করবে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তবে তারও বিধান একই রূপ হবে।

ঠিক যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করবে এবং কোন ব্যক্তি সৎকাজ করল অথচ ঈমান ভঙ্গকারী পাপে সে জড়িত থাকল তবে সেও অত্র বিধানের আওতায় পড়বে। অর্থাৎ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«تَعِسَ عَبْدُالدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُالدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»(صحيح البخاري، الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، ح:٢٨٨٧)

"দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ সম্পদের পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী [পোশাক-বিলাসী] ধ্বংস হোক। যাকে দিলে খুশী, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয় সে ধ্বংস হোক, তার আরো করুণ পরিণতি হোক, কাঁটা-বিধলে সে তা খুলতে সক্ষম না হোক [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দার সৌভাগ্য যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধুলিমলিন। তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয় সে তা যথাযথ পালন করে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি প্রার্থনা করলে তাতে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।"[২]

সে মুমিন থাকবে না। যদিও দাবী করে যে সে মুমিন কিন্তু সে তার দাবীতে সত্য নয় কেননা সে যদি সত্যবাদী হত তবে আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করত।

২। এখানে কেউ যদি দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে নবী (ﷺ) তাকে আব্দুদ্ দীনার বা দীনারের বান্দা বা পূজারী বলেছেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, দাসত্ব্যের বিভিন্ন স্তর আছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ছোট শিরক পর্যায়ের দাসত্ব।

বলা হয়ে থাকে, অমুক ব্যক্তি ঐ বস্তুর পূজারী। কেননা সে বস্তুই তার কার্যক্রমের কারণ। আর এ কথাও বিদীত যে পূজারী আপন প্রভূর আনুগত্যই করে থাকে এবং তার প্রভূ তাকে যে দিকে ধাবিত হতে বলবে সেদিকেই সে ধাবিত হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২। সূরা হূদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। একজন মুসলিমকে সম্পদ ও পোশাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪। উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা, বান্দাকে দিতে পারলেই খুশি হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়।

৫। দুনিয়াদারকে আল্লাহ্‌র নবী এ বদদু'আ করেছেন, 'সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।'

৬। দুনিয়াদারকে এ বলেও অভিসম্পাত করেছেন, 'তার গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হোক এবং তা সে খুলতে না পারুক।'

৭। হাদীসে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকারী মুজাহিদের প্রশংসা।

অধ্যায়-৩৭

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করল, আলেম, বুযুর্গ ও নেতাদের অন্ধভাবে আনুগত্য করল, সে মূলতঃ তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল।*

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

«يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَّعُمَرُ»(مسند أحمد: ١/ ٣٣٧)

"তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অথচ তোমরা বলছো, 'আবু বকর (رضي الله عنه) এবং ওমর (رضي الله عنه) বলেছেন।'[১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঐ সব লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদীসের সনদ ও সিহ্হাত [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদীসের পরম্পরা ও সহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর মতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

* অত্র অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাওহীদের চাহিদা ও দাবী এবং কালেমা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপকরণ সংক্রান্ত বর্ণনা হয়েছে। কিতাব ও সুন্নাত বুঝার মাধ্যম হলো উলামায়ে কেরাম। বলা হয়েছে যে, তাদের অনুসরণ আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণের অধীনেই নিয়ন্ত্রিত হবে। নিরঙ্কুশ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র যা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ইজতেহাদী বিষয়ে অর্থাৎ যেখানে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান বুঝা যাচ্ছে না সেখানে আলেমদের অনুসরণ করতে হবে কেননা আল্লাহ্ তার অনুমতি দিয়েছেন।

১। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর কথার মর্মার্থ হচ্ছে যে, নবী (ﷺ) কথার বিপরীত কারো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তিনি আবু বকর বা উমর (رضي الله عنه) হোন না কেন। তবে তারা ব্যতীত অন্যের কথা রাসূলুল্লাহর সামনে কিভাবে পেশ করা যেতে পারে?

অর্থঃ "অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁরা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপদ তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"[২] (সূরা নূর, আয়াতঃ ৮৩)

তুমি কি ফিত্না সম্পর্কে কিছু জান? ফিত্না হচ্ছে শিরক। সম্ভবতঃ তাঁর কোনো কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আদী বিন হাতেম (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (ﷺ) কে এ আয়াত পড়তে শুনেছেনঃ

﴿ اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থঃ "তাঁরা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত। তখন আমি নবীজিকে বললাম, 'আমরাতো তাদের ইবাদত করি না।" (সূরা তাওবাঃ ৩১)

তিনি বললেন, 'আচ্ছা আল্লাহ্র হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম বলে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহ্র হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললে, তোমরা কি তা হালাল বলে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, 'এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য)।'[৩] আহমাদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযি হাসান বলেছেন।

২। কারো কথার কারণে নবী (ﷺ) এর কথা যদি প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয়। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের কথা বলেছেনঃ "দলীল-প্রমাণ থাকা সত্বেও তারা তাদের ইচ্ছাধীন বক্রতা অবলম্বন করল আল্লাহ ও শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়েছেন।"

৩। ধর্মীয় নেতাদের হালাল-হারামের ব্যাপারে অনুসরণ দু'প্রকার। প্রথমটি ধর্মীয় নেতাদের বা উলামাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দ্বীন পরিবর্তনে অনুসরণ অর্থাৎ হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল মেনে নেয়া শুধু তাদের ধর্মীয় নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের সম্মান ও তাদের অনুসরণের জন্য অথচ সে জানে যে এটা হারাম। এটাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে তারা ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। এটা বড় ধরনের কুফরী এবং শিরকে আকবার এবং তা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য মূলক ইবাদত পালন করা। দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলার ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা। অথচ সে বুঝে এর জন্যে সে পাপী এবং সে তার গুনাহকেও স্বীকার করে কিন্তু সে পাপের প্রতি আসক্তি বা তাদের নৈকট্য পাওয়ার আসক্তি হওয়াই তাদের অনুসরণ করে থাকে। অতএব এ সমস্ত লোকেরা হলো গুনাহগার। সম্মানিত লেখক এখানে সূফীদের ত্বরীকা, সূফীদের সীমালংঘন এবং সূফী সম্রাটদের বাড়াবাড়ির ব্যাপারে

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আদী বিন হাতেম ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক আবু বকর এবং ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর দৃষ্টান্ত আর ইমাম আহমাদ (রহঃ) কর্তৃক সুফইয়ান সওরীর দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জানতে পারা।

৫। অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পণ্ডিত ও পীর বুযুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদত বলে গণ্য হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় 'বেলায়েত।' আহ্বার তথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো, সে সালেহ বা পূণ্যবান হিসেবে গণ্য হলো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করলো অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য ইবাদত করলো, সেই জাহেল বা মূর্খ হিসেবে গণ্য হলো।

সতর্ক করেন। তারা তাদের পীরদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং ঐ সমস্ত অলীর অনুসরণ করে যারা তাদের ধারণায় অলী, যারা প্রকৃত দ্বীনকে রদ-বদল করে ফেলে। আর এটিই হলো ঐ সকল বান্দাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব বানিয়ে নেয়া।

অধ্যায়-৩৮

ঈমানের দাবীদার কতিপয় লোকের অবস্থা

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন—

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

অর্থঃ "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের দিকে নিয়ে ফয়সালা করতে চায় ।"* (সূরা নিসাঃ ৬০)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

অর্থঃ "যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন তাকে অবিশ্বাস করে, এবং শয়তান ইচ্ছা করে যে, তাদেরকে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত করে ।"[১]

---

* যেমন আল্লাহ্ তাঁর তাওহীদে রুবুবীয়াত ও তাওহীদে ইবাদতে একক ঠিক তেমনই বিধি বিধান ও হুকুম-ফয়সালাতেও তাঁকে এককভাবে মানতে হবে। সুতরাং অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদ এবং কালেমায়ে শাহাদাত বাস্তবায়ন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী হুকুম-ফয়সালা ছাড়া হবে না। জাহেলীয়াত যুগের বিধান তথা প্রথা এবং প্রাচীন কথ্যকাহিনীর কারণে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে পরিত্যাগ করা বড় ধরনের কুফরী হবে যা কালিমা তাওহীদকে বিনষ্ট করে দিবে। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (রহঃ) তার গ্রন্থ 'তাহ্কীমূল কাওয়ানীন'- এ উল্লেখ করেন যে নবী (ﷺ) এর উপর জিব্রাঈল আমিন মারফত নাযিলকৃত মহান আল্লাহর বিধানকে মানবরচিত বিধানের সমতুল্য মনে করা বড় ধরনের কুফুরী ও নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী।

১। মূলতঃ যারা বিচার ফয়সালার জন্য তাদের কাছে যায়, তারা মিথ্যাবাদী তাঁদের ঈমানই নেই। আয়াতে বর্ণিত (يريدون أن يتحاكموا...) তারা চায় যে, আপন হুকুম ফয়সালা তাগুতের নিকট নিয়ে তার থেকে ফয়সালা করাবে। এর (يريدون) (তারা চায়) শব্দ দ্বারা এক গুরুত্বপূর্ণ কায়দার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর তা হলো তাগুতের নিকট থেকে ফয়সালা গ্রহণকারীর ঈমান তখন নাকচ হয়ে যায়, যখন সে স্বীয় ইচ্ছা ও আনন্দ চিত্তে তার থেকে ফয়সালা গ্রহণ করে

(সূরা নিসাঃ ৬০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾

অর্থঃ "এবং যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো শুধু শান্তি স্থাপনকারীই।"[২] (সূরা বাকারাঃ ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾

অর্থঃ "দুনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (সূরা 'আরাফঃ ৫৬)

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾

অর্থঃ "তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফায়সালা কামনা করে।"[৩] (সূরা

ও তাকে অপছন্দ করে না। সুতরাং এক্ষেত্রেই ইচ্ছা-ইখতিয়ারকে একটি শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাগুতের নিকট থেকে স্বেচ্ছায় ফয়সালা কুফরের হুকুমে। (পক্ষান্তরে যদি তাকে তাগুত দ্বারা ফয়সালা করতে বা তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, আর সে তা অপছন্দও করে তবে এমন নিরুপায় ব্যক্তি ঈমান মুক্ত হবে না।) وقد أمروا... তারা তাগুত ও তার ফয়সালার প্রতি কুফরী করতে আদিষ্ট তাগুত দ্বারা ফয়সালা করানোকে অস্বীকার করা এবং তার সাথে কুফরী করা শুধু ওয়াজিবই নয় বরং তা তাওহীদের এক অপরিহার্য অংশ ও আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ويريد الشيطان আয়াতের এ অংশ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দ্বারা ফয়সালা করানোর ইচ্ছা রাখা এবং তা গ্রহণ করা সরাসরি শয়তানী ইলহাম ও তার কুমন্ত্রণা দ্বারাই হয়ে থাকে।

২। 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্র বিধান ছাড়া অন্যের বিধান বাস্তবায়নে ও তাঁর সাথে শিরক করার মাধ্যমে বিপর্যয় ঘটে থাকে। পৃথিবীতে শরীয়ত ও তাওহীদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিরক এর মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। অত্র আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার বুঝা যায় যে মুনাফেকরা শিরকও এ জাতীয় গর্হিত কাজের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যায়ের সৃষ্টি করে যদিও তারা বলে থাকে যে আমরাই তো শান্তি কামী।

৩। 'তারা কি বর্বর যুগের আইন চায়?' জাহেলী যুগের মানবরচিত আইনই সমাজ পরিচালিত হত এবং সেটাকে তারা শরীয়তের মতো বিধান মনে করত। আর তা মনে করার অর্থ হলো,

মায়েদাঃ ৫০)

আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ»(قال النووي في الأربعين، ح:٤١ حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح)

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।" (ইমাম নববী হাদীসটি সহীহ বলেছেন)

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেছেন, একজন মুনাফিক এবং একজন ইহুদীর মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া হচ্ছিল। ইহুদী বললো, 'আমরা এর বিচার-ফায়সালার জন্য মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কাছে যাবো, কেননা মুহাম্মাদ (ﷺ) ঘুষ গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিল। আর মুনাফিক বললো, 'ফায়সালার জন্য আমরা ইহুদী বিচারকের কাছে যাব, কেননা ইহুদীরা ঘুষ খায়, এ কথা তার জানা ছিল। অবশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তারা এর বিচার ও ফয়সালার জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾

অর্থঃ "তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা নিজেদের মোকাদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন তাকে অবিশ্বাস করে; এবং শয়তান ইচ্ছা করে যে, তাদেরকে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত করে।"

আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেটাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করা ও আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা যা প্রকৃতপক্ষে অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক।

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত দু'জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিল, মীমাংসার জন্য আমরা নবী (ﷺ) এর কাছে যাব, অপরজন বলেছিল কা'ব বিন আশরাফের কাছে যাব। পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য ওমর (رضي الله عنه) এর কাছে গেল। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উপস্থাপন করলো। যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর বিচার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তাকে লক্ষ্য করে ওমর (رضي الله عنه) বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এরকম? সে বললো, 'হ্যাঁ'। তখন ওমর (رضي الله عنه) তরবারির আঘাতে লোকটিকে হত্যা করে ফেললেন।'

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষত্রে সহযোগিতা।

২। সূরা বাকারার ১১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা আ'রাফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াতের তাফসীর।

৫। এ অধ্যায়ে প্রথম আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) এর বক্তব্য।

৬। সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭। মুনাফিকের সাথে ওমর (رضي الله عنه) এর ঘটনা।

৮। প্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (ﷺ) এর আনীত আদর্শের অনুগত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার না হওয়ার বিষয়।

অধ্যায়-৩৯
আল্লাহ্‌র 'আস্‌মা ও সিফাত' [নাম ও গুণাবলী] অস্বীকারকারীর পরিণাম *

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَٰكَ فِىٓ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾

অর্থঃ "এই ভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি করার জন্যে, যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে ; তুমি বল তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।"[১] (সূরা রা'দঃ ৩০)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে আলী (ﷺ) বলেনঃ "লোকদের এমন কথা

---

* অত্র অধ্যায়ের মুল গ্রন্থের সাথে সম্পর্ক দু'ধরনের; প্রথমটি হচ্ছে যে, ইবাদতে তাওহীদের প্রমাণ পুঞ্জীর মধ্যে নাম এবং গুণের তাওহীদ ও অন্যতম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণ বিষয়ে কিছু অস্বীকার করা শিরক ও কুফুরী যা মানুষকে ধর্মচ্যুত করে। যখন প্রমাণিত হবে যে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নাম ও বা গুণ নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা রাসূল (ﷺ) তা নির্ধারণ করেছেন কিন্তু তা সত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তা অস্বীকার করে তবে সেটা কুফুরী হবে কেননা কিতাব ও সুন্নাতের মিথ্যারোপ করা হল।

১। রহমান আল্লাহ্‌র নাম সমূহের একটি কিন্তু মক্কার মুশরিকগণ বলতো আমরা ইয়ামামা এর রহমান ছাড়া কাউকে রহমান হিসাবে জানি না। ফলে তারা রহমানকে অস্বীকার করতো আর তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই অস্বীকার করা। রহমান রহমত গুণের অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহর প্রত্যেক নামেই একটি গুণ অন্তর্ভুক্ত বরং আল্লাহর প্রত্যেক নামেই দুইটি বিষয় রয়েছেঃ প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালার স্বত্বা। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ঐ গুণ যার অর্থ ঐ নামই প্রকাশ করে থাকে। এজন্যে আমরা বলবঃ আল্লাহর প্রত্যেক নামেই আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে কোন গুণ অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্ শব্দটি ইলাহ যার অর্থ ইবাদত থেকে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

বল, যা দ্বারা তারা (আল্লাহ্ ও রাসূল [ﷺ] সম্পর্কে) সঠিক কথা জানতে পারে।[২] তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হোক?'

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) থেকে একটি হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহ্র গুণকে অস্বীকার করার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৩] তখন তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করলো? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখালো, আর মুতাশাবেহ্ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করলো?

কুরাইশরা যখন রাসূল (ﷺ) এর কাছে [আল্লাহ্র গুণবাচক নাম] 'রহমানের কথা শুনতে পেলো, তখন তারা 'রহমান' গুণটিকে অস্বীকার করলো।[৪] এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

২। "লোকদের এমন কথা বলো যে ব্যাপারে তারা পরিচিত" দ্বারা বুঝা যায় যে, কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে জানা প্রত্যেকের প্রযোজ্য নয়। ফলে নাম এবং গুণবোধক তাওহীদের কিছু কিছু সূক্ষ্ম মাছআলা সম্পর্কে জনসম্মুখে আলোচনা না করায় উত্তম, তবে মোটামুটিভাবে তার উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব যা কুরআন ও সুন্নাতে প্রকাশিত। কেননা আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলীর অস্বীকার একটি কারণ হলো কোন ব্যক্তি লোকদের সামনে নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে এমন কথা বলে থাকে যা বুঝতে তারা অক্ষম যার ফলে তারা তা পুরাপুরি অস্বীকার করে ফেলে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ করে উলামাদের উপর ওয়াজিব হলো, তারা লোকদেরকে আল্লাহ যা বলেছেন ও তাঁর নবী যা খবর দিয়েছেন তার কোন কিছুর যেন অস্বীকারকারী না বানায়, অর্থাৎ তারা যেন লোকদেরকে এমন কিছু বর্ণনা না করে যা তারা বুঝতে পারবে না এবং যে পর্যন্ত তাদের জ্ঞানও পৌঁছবে না, ফলে তা হবে তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণ।

৩। আল্লাহ্র যাবতীয় গুণাবলীকে স্বীকার করতেই হবে কোন প্রকার উদাহরণ উপমা ব্যতীরেকেই। উল্লেখিত ব্যক্তি এই হাদীসকে একেবারে অপরিচিত ভেবে শুনামাত্র কেঁপে উঠে। তার এ অবস্থা হওয়ার কারণ হলো, সে বুঝেছিল আল্লাহর এই গুণে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য ও তুলনা হয়ে যায়, তাই সে উক্ত গুণ থেকে ভয় পেয়ে যায়। অথচ, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হলো, যখনই আল্লাহ তায়ালার কোন গুণ কুরআন ও হাদীস থেকে শুনবে তখন তার সেইরূপই অর্থ গ্রহণ করবে যেরূপ অন্য গুণাবলীর নেয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জন্য তার গুণাবলীকে ঐভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে তাতে মাখলুকের সাথে কোন ভাবেই কোন সাদৃশ্য ও তুলনা জ্ঞাপন করা যাবে না এবং না তার নির্ধারিত ধরণ-আকৃতি বর্ণনা করা হবে। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) ঐ সমস্ত লোকের অন্তরের অবস্থা জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে বলেনঃ এরা কেমন যে, যখন তারা এমন কথা শুনে যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই তখন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায় কিন্তু যখন তারা কুরআন ও সুন্নাহর এমন কথা শ্রবণ করে যা তাদের বুঝে আসে না, তার প্রতি তারা ঈমান না রেখে তার অপব্যাখ্যা, অস্বীকার ও নাকচ করে থাকে। যার ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

৪। আল্লাহ্র কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে তা বিশ্বাস না করা এবং যা কুফুরী।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র কোনো নাম ও গুণ অস্বীকার করা কুফরির শামিল।

২। সূরা রা'দের ৩০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা।

৪। অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।

৫। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর কোনো একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

অধ্যায়-৪০

আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ﴾

অর্থঃ "তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত বা অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।" (সূরা নাহলঃ ৮৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোনো মানুষের এ কথা বলা 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।'[১] আ'উন ইবনে আবদিল্লাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতো না।[২] ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকরা বলে, 'এটা হয়েছে আমাদের ইলাহ্‌দের সুপারিশের বদৌলতে।'[৩]

---

* যাবতীয় নিয়ামতকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করা বান্দার প্রতি ওয়াজিব। এর মাধ্যমেই তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। কোন প্রকার নিয়ামতকে আল্লাহ্ ছাড়া কারো সাথে সম্পৃক্ত করা তাওহীদের পূর্ণতায় ঘাটতির সৃষ্টি করে এবং তা ছোট শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

১। 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী কথাও এক ধরনের শিরক। কেননা এখানে সম্পদকে নিজের দিকে ও পূর্বপুরুষদের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে অথচ এ সম্পদ আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্বরূপ তার পূর্বপুরুষকে এবং পরবর্তীতে তাকে দিয়েছেন যে সে পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে তা অর্জন করেছেন। তোমার নিকট পর্যন্ত সম্পদ পৌছাতে তোমার পিতা শুধু একজন মাধ্যম ফলে, পিতা তার ইচ্ছামত সম্পদ বন্টন করতে পারেন না কেননা বাস্তবে মাল তার নয়।

২। 'অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতো না' যেমন কেউ বলেঃ এই পাইলট যদি না হতো তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হতাম। এ ধরনের কথা সম্পূর্ণ নাজায়েয যার মধ্যে কোন কর্মের সম্পর্ক ঐ কর্মের মাধ্যম বা কারণের প্রতি করা হয়। সেটা কোন মানুষের ব্যাপারে হোক, কোন জড় পদার্থের ব্যাপারে হোক, কোন স্থান বা মাখলুক যেমন- (বৃষ্টি, পানি এবং বাতাস এর ব্যাপারে হোক।)

৩। মুশরিকরা বলে 'এটা হয়েছে আমাদের ইলাহ্‌দের সুপারিশের বদৌলতে।' তারা যখনই কোন জিনিস অর্জন করত তখন তারা বলতো যে এটা আমরা অর্জন করেছি আমাদের ওলী বা নবী বা কোন মূর্তি বা দেবদেবীর কারণে। এসব মুহূর্তে তারা তাদের উপাস্যদের স্মরণ করতো অথচ

আবুল আব্বাস যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীসে যাতে একথা আছে, 'আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

«إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»(صحيح البخاري، الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ح:٨٤٦ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ح:٧١)

"আমার কোনো বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মু'মিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায় হাদীসের শেষ পর্যন্ত পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তারপর তিনি বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যে ব্যক্তি নেয়ামত দানের বিষয়টি গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ্ তার নিন্দা করেন।"

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো সালফে সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতোই, 'অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকূল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।[৪]

যিনি এগুলো দান করেছেন সে আল্লাহ্কে তারা ভুলে যেত অথচ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এমন কোন শিরকী সুপারিশ কবুল করবেন না যা তারা স্মরণ ও ধ্যান করে থাকে।

৪। আলোচ্য মাসয়ালাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা। লোকদেরকে এর প্রতি সতর্ক করা উচিত, কেননা আমাদের প্রতি আল্লাহর অগণিত নেয়ামত যা গণনা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের জন্য ফরয ও অপরিহার্য হলো তাঁর নেয়ামতের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকেই সাব্যস্ত করা এবং তাকে স্মরণ ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের সবচেয়ে বড় স্তর হলো নেয়ামতের সম্বন্ধ তাঁর দিকেই সাব্যস্ত করা। তিনি তাঁর নবীকে নির্দেশ করেনঃ

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

অর্থাৎ "আর তুমি তোমার রবের নেয়ামত সমূহকে বর্ণনা করতে থাক।" অর্থাৎ তুমি বলতে থাক যে, এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহে, এটা আল্লাহরই নেয়ামত। কেননা অন্তর যদি কোন মাখলূকের দিকে ধাবিত হয়ে যায় তখন মানুষ শিরকে পতিত হয়ে যায় আর এ শিরক তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। সকল প্রকার নিয়ামত আল্লাহ্র দিকেই সম্বোধন করা ও তার যোগ্যতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। তোমার উচিত হবে যে তুমি বলবে এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহে, এটা আল্লাহ্র নিয়ামত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২। জেনে শুনে আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

৩। মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত এসব কথা আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।

৪। অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

অধ্যায়-৪১

শিরকের কতিপয় গোপনীয় অবস্থা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ "অতএব আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না।"* (সূরা বাকারাঃ ২২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আন্দাদ হচ্ছে এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কাল পাথরের উপর পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম।[১] এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, 'আল্লাহ্র কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম।' 'যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর ঢুকতো।' 'হাঁসটি যদি ঘরে না থাকতো তাহলে অবশ্যই চোর আসতো।' কোনো ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা, 'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন' ও 'তুমি যা চেয়েছো' এবং এ কথা বলা যে আল্লাহ্ এবং উমুক না হলে এসব ক্ষেত্রে উমুক কথা প্রয়োগ করো না। বর্ণিত সকল বক্তব্যই শিরক। (ইবনে আবি হাতিম)

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ

---

* তাওহীদের হাকিকত বা মর্মকথা হচ্ছে যে, হৃদয় গহীনে 'আল্লাহ্ ছাড়া কেউ থাকবেনা তাঁর কোন শরীক নেই, নেই কোন সমকক্ষ।' 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে কছম করা, যদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকতো এ জতীয় কথা প্রয়োগ না করে শুধু আল্লাহ্র ব্যাপারে উল্লেখ করায় প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে দুটি স্তর রয়েছে; প্রথমটি হচ্ছে পূর্ণতা অর্থাৎ পরিপূর্ণ তাওহীদ যেমন সে বলবে, 'যদি আল্লাহ্ না থাকতেন তবে এমন হতো না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জায়েয, যেমন সে বলবে 'যদি আল্লাহ্ না থাকতেন অতঃপর অমুক না থাকতো তবে এটা হতো না' কিন্তু এটা পূর্ণ তাওহীদ নয়, প্রথমটায় হচ্ছে পরিপূর্ণ তাওহীদ এজন্যই ইবনে আব্বাস বলেছেন এখানে অমুককে রেখ না।

১। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) যে বলেছেন, এগুলো সবই শিরক, যেমন কেউ যদি বলে আল্লাহ্ এবং অমুক যদি না থাকতো কেননা واو, যার অর্থ "এবং" যা অংশীদারিত্ব ও বিলম্বহীনতার অর্থ বহন করে। পক্ষান্তরে ثم যার অর্থ অতঃপর, বিলম্বের অর্থ প্রকাশ করে। ফলে যদি আল্লাহ্ না থাকতেন অতঃপর অমুক না থাকতো বলা বৈধ হবে ; কিন্তু পূর্বের বাক্যটি অর্থাৎ واو দিয়ে বাক্যটি শিরকে আসগার হবে।

করেছেনঃ

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(جامع الترمذي، الأيمان والنذور، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، ح:١٥٣٥ والمستدرك للحاكم:١/١٨)

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্‌র নামে কসম করলো, সে কুফরী অথবা শিরক করলো।"[২] ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকেম তাকে হাসান ও সঠিক বলেছেন।

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেছেনঃ

«لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا» (معجم الكبير للطبراني:٩/١٨٣، رقم:٨٩٠٢ ومصنف عبدالرزاق:٨/٤٦٩، رقم:١٥٩٢٩)

"আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে গাইরুল্লাহর নামে সত্য শপথ করার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।"[৩]

হুযাইফা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেনঃ

২। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে কসম খাবে সে কুফুরী অথবা শিরক করবে। কসম মূলতঃ বাক্যের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং যার নামে কসম করা হয় তার বড়ত্ব প্রকাশ পায়, ফলে কসম আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া শিরকে আসগার তথা ছোট শিরক কিন্তু কখনও কখনও তা বড় শিরকে পরিণত হতে পারে যখন কসমকৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র মতো বড়ত্ব দান করা হবে। কসম তিন অক্ষরের যে কোন একটি দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে। অক্ষরগুলি হচ্ছে- الواو، الباء، التاء

কসমের নিয়ত না করেও সচরাচর যারা বলে থাকেন নবীর (ﷺ) এর কসম, কাবা ঘরের কসম, যে কোন ওলীর নামে কসম ইত্যাদি সেগুলোও শিরকে পরিণত হবে। কেননা এতে গায়রুল্লাহর সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে।

৩। আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম করা অপেক্ষা গাইরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা বলা কবীরাগুনাহ্ হলেও শিরকে আসগার তথা ছোট শিরক তার চেয়েও মারাত্মক। ফলে ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) পছন্দ করতেন যে, তাওহীদের সাথে মিথ্যা বলবেন কিন্তু শিরকের সাথে সত্য বলবেন না। কেননা তাওহীদের উত্তমতা মিথ্যার ঘৃনতার চেয়ে বড় এবং শিরকের ঘৃনতা, মিথ্যার ঘৃনতার চেয়ে নিকৃষ্ট।

"আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন, এ কথা তোমরা বলো না। বরং এ কথা বলো, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে।" (আবু দাউদ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)[৪]

ইব্রাহীম নাখ্য়ী থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, اعوذ بالله وبك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই'। এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর اعوذ بالله ثم بك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।' এ কথা বলা তিনি জায়েয মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, لولا الله ثم فلان 'যদি আল্লাহ্ অতঃপর অমুক না হয়' এ কথা বলে, কিন্তু لو لا الله وفلان অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ্ এবং অমুক না হয়' এ কথা বলো না।[৫]

৪। এ "নাহী" (নাকচ করা) হারাম অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ এ ধরনের কথা বলা হারাম। কেননা এ ধরনের কথা দ্বারা ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা হয়ে থাকে। তবে অবশ্য এ ধরনের কথা বলা জায়েয হবেঃ "তাই হবে যা আল্লাহ চাইবেন অতপর অমুক" কেননা মানুষের ইখতিয়ার আল্লাহর ইখতিয়ারের অধীন, যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

অর্থঃ "তুমি চাওনা কিন্তু তাই চাও যা আল্লাহ তায়ালা চায়--" (সূরা দাহরঃ ৩০)

৫। ইবরাহীম নাখয়ীর "আমি আল্লাহ ও আপনার কাছে আশ্রয় চাই" এ ধরনের কথা অপছন্দের কারণ হলো, এখানে الواو বর্ণটি আশ্রয় চাওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের দাবী রাখে। আশ্রয় চাওয়ার দুটি দিক যা ইতিপূর্বে বর্ণনাও করা হয়েছেঃ প্রকাশ্য দিক ও অপ্রকাশ্য দিক।
শরণাপন্ন হওয়া, আশ্রয় লওয়া, কামনা, ভয়-ভীতি এবং যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে তার দিকে হৃদয়কে ধাবিত করা একমাত্র আল্লাহর জন্যে বিশুদ্ধ অন্যের জন্যে নয়। বর্ণিত কারাহাত বা অপছন্দনীয় দ্বারা সালাফে সালেহীন অধিকাংশই হারাম উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। কখনো কখনো তা হারাম নয় এমন ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু তা একমাত্র সে ক্ষেত্রেই যার কোন দলীল নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা সংক্রান্ত সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতের তাফসীর।

২। শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কেরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।

৩। গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরক।

৪। গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করা, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ্।

৫। বাক্যে অবস্থিত الواو এবং ثم এর মধ্যে পার্থক্য।

অধ্যায়-৪২

আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَّمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»(سنن ابن ماجه، الكفارات، باب من حلف له بالله فليرض، ح:٢١٠١)

"তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে, তার উচিত সত্য কসম করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে কসম করা হয়, তার উচিত উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ্‌র কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোনো আশা নেই।"[১] (ইবনে মাজা উত্তম সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

২। যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে কসম করা হলো, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।

৩। আল্লাহ্‌র নামে কসম করার পর, যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

১। এ বিধান সকল প্রকার কসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিচারকের কাছে হোক কিংবা যেখানেই হোক কসমে যেহেতু বড়ত্ব প্রমাণ করা হয়। ফলে যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে কসম খাওয়া হবে তার উচিত তাকে বিশ্বাস করা যদিও সে মিথ্যা কসম খায় কিন্তু তার উপরে ভরসা না করা তাঁর জন্য বৈধ হবে। তবে সে যে মিথ্যা কসম খেয়েছে তা জানতে দিবে না। যেহেতু কসমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব কামনা করা হয়েছে।
আল্লাহ্‌র কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হল না, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই। এ দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্‌র কসমের প্রতি সন্তুষ্টি না হওয়া কবীরা গুনাহ।

অধ্যায়-৪৩

আল্লাহ্ এবং আপনি যা চেয়েছেন বলার হুকুম*

কুতাইলাহ বর্ণনা করেনঃ

«أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَآءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَآءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ»(سنن النسائي، الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة، ح:٣٨٠٤)

"একজন ইহুদী রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে বললো, 'আপনারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করে থাকেন।' কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاء الله وشئت আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চেয়েছেন।' আপনারা আরো বলে থাকেন, والكعبة অর্থাৎ কা'বার কসম। এরপর রাসূল (ﷺ) সাহাবাগণকে বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে, ورب الكعبة 'কা'বার রবের কসম' আর যেন, ماشاء الله ثم شئت 'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন' একথা বলে।"[১] (হাদীসটি নাসায়ী বর্ণনা করেছেন এবং তা সহীহ বলেছেন।)

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছেঃ

«أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَآءَ اللهُ وَشِئْتَ فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَآءَ اللهُ وَحْدَهُ»(عمل اليوم والليلة للنسائي، ح:٩٨٨ ومسند

---

* একথা বলা শব্দগত শিরক এবং ইখতিয়ারে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর শিরক সাব্যস্ত হয়। আর এ শিরক হলো শিরকে আসগার।

১। এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কখনো কখনো প্রবৃত্তি পূজারীরাও হক্বপন্থীদের প্রতিবাদ করে থাকে যে, যেমন তাদের মধ্যে ভ্রান্ততা রয়েছে হক্বপন্থীদের মধ্যেও রয়েছে। সুতরাং হক্বপন্থীদের উচিত যদি এরূপ হয়ে থাকে তবে, সঙ্গে সঙ্গেই হক গ্রহণ করে নেয়া তা যার নিকট থেকেই পাওয়া যায়। কখনও কখনও কুপ্রবৃদ্ধি স্বভাবের লোকেরাও সঠিক পথ বুঝতে পারে এবং তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুলমানের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা হক সর্বদা গ্রহণযোগ্য যদিও তা ইহুদী খ্রিস্টানদের মাধ্যমে আসুক না কেন।

أحمد: ١/ ٢١٤)

"এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর উদ্দেশ্যে বললো, ماشاء الله وشـــئت [আপনি এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, أجعلتنى الله نداً 'তুমি কি আল্লাহ্‌র সাথে আমাকে শরীক করে ফেলেছো?' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, তা এককভাবেই করেছেন।[২]

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এর মায়ের পক্ষীয় [আখ্ইয়াফী] ভাই, তোফায়েল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

«رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلٰى نَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ قُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ:عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِّنَ النَّصَارٰى فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأٰى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَّلٰكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(سنن ابن ماجه، الكفارات، باب النهي أن يقال:ماشاء الله وشئت، ح:٢١١٨ ومسند أحمد: ٥/ ٧٢)

২। শিরকে আসগার তথা ছোট শিরকগুলি নবী (ﷺ) পর্যায়ক্রমে দূর করেছেন কিন্তু বড় বড় শিরক নবুয়তের প্রথম থেকেই দূরীভূত করেছেন এবং শিরকে আকবার উৎখাতে কাল বিলম্ব করা জায়েয হবে না। তবে শব্দগত শিরক বা ছোট শিরক বিশেষ স্বার্থে যেমনঃ দাওয়াতের স্বার্থে অথবা স্বল্প গুরুত্বের বিষয়ের উপর মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বৃহৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেগুলোকে দেরীতে নিষেধ করা যেতে পারে, কিন্তু মহা শিরক কোন প্রকার স্বার্থের কারণে সহ্য করা যাবেনা।

“আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহ্‌র পুত্র না বলতে। তারা বললো, ‘তোমরাও অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ماشاء الله وشـــاء محمـــد [আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা ইচ্ছা করেন।’ এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, ‘ঈসা (ﷺ) আল্লাহ্‌র পুত্র এ কথা না বললে, তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে পারতে। তারা বললো, ‘তোমরাও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা একথা না বলতে, ‘আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেছেন। সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। অতঃপর আমি নবী (ﷺ) এর কাছে এসে তাকে এ সংবাদটি জানালাম। তিনি বললেন, এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছো? বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং ক্ষণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, ‘তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলা বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলে থাক, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ما شاء الله وشاء محمـــد অর্থাৎ ‘আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা ইচ্ছা করেন’ একথা বলো না বরং তোমরা বলো ماشاء الله وحده অর্থাৎ ‘এককভাবে আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন।’

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।

২। কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩। রাসূল (ﷺ) এর উক্তি, ماشاء الله وشئت [তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছো?] [অর্থাৎ এ কথা বললেই যদি শিরক হয়], তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, مالى من الوذ به ســـواك হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং [এ কবিতাংশের] পরবর্তী দুটি লাইন। [অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শিরকী গুনাহ্ হবে। অথবা কেউ যদি রাসূল (ﷺ) কে আহ্বান করতঃ বলেঃ হে রাসূলদের ইমাম! আমার তো একমাত্র আপনি ভরসা, আপনি তো আমার জন্য আল্লাহর দরজা। হে রাসূল আপনি ইহকালে আমার হাত ধরে থাকুন ও পরকালেও ধরবেন কেননা আপনি ব্যতীত আমার সংকীর্ণতাকে কেউ সহজ করতে পারবে না। ইত্যাদি এসব অবশ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪। নবী (ﷺ) এর বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার (বড় শিরক) এর পর্যায়ভুক্ত নয়।

৫। নেক স্বপ্ন অহীর অংশ বিশেষ।

৬। স্বপ্ন শরীয়তের কোনো কোনো বিধান জারির কারণ হতে পারে।

অধ্যায়-৪৪

যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়।*

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন–

﴿ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ ﴾

অর্থঃ "অবিশ্বাসীরা বলে শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি, যামানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।"[১] (সূরা জাসিয়াতঃ ২৪)

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরা (ﷺ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»(صحيح البخاري، التفسير، سورة حم الجاثية، باب وما يهلكنا إلا الدهر، ح:٤٨٢٦ وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، ح:٢٢٤٦)

"আদম সন্তান আমাকে পীড়া দেয়। কারণ, সে কালকে গালি দেয়।[২] অথচ

---

* যমানাকে ভালোমন্দ বলা বা গালি দেয়া নাজায়েয। এ ধরনের অভ্যাস বর্জন করা খুবই জরুরী। যমানাকে গালি দেয়া পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। সাধারণত মূর্খ লোকদের দেখা যায় যে তারা যমানাকে গালি দেয়, যখনই কোন সময় তাদের মন মতো কোন কাজ হয় না তখনই তারা সে সময় বা যুগকে কটূক্তি এবং সেই দিন অথবা মাস অথবা বছরকে অভিশাপ প্রদান করে। একথা সর্বজন বিদিত যে যমানার কিছু করার ক্ষমতা নেই বরং যা কিছুর পরিবর্তন ঘটে তা স্বয়ং আল্লাহ্ করেন। ফলে গালি আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়। যামানাকে গালি দেয়ার কয়েকটি স্তর আছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো যামানাকে অভিশাপ করা ; কিন্তু কোন কোন বছরকে কঠিন বছর বলা অথবা কোন কোন দিনকে কালোদিবস হিসাবে আখ্যায়িত করা অথবা কোন কোন মাসকে অশুভ বলে আখ্যায়িত করা যমানাকে গালি দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এটা নির্দিষ্ট একটা ব্যাপার। যে দিনে তার ভাগ্য তার সহায় হয়নি অর্থাৎ যেন সে তার অবস্থার বর্ণনা করছে যমানার ভাল মন্দের নয়।

১। তাওহীদবাদীরা প্রতিটি বস্তুর সম্বোধন আল্লাহ্‌র দিকে করেন আর মুশরিকগণ প্রতিটি বস্তুর সম্বোধন যামানার দিকে করে।

২। এর অর্থ এ নয় যে, যামানা আল্লাহ্‌র নামসমূহের একটি। বরং এখানে বলার অর্থ হলো, যামানা স্বয়ং না কোন জিনিসের মালিক না কিছু করে বা করতে পারবে বরং যামানার প্রকৃত

আমিই হচ্ছি কাল। আমিই [যমানার] রাত দিনকে পরিবর্তন করি।"

অন্য বর্ণনায় আছে–

«لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ»(صحيح مسلم، الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر، ح:٢٢٤٦)

"তোমরা যামানাকে গালি দিওনা। কারণ, আল্লাহ্ই হচ্ছেন যামানা।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। কালকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। কালকে গালি দেয়া আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

৩। فإن الله هـو الـدهر আল্লাহ্ই হচ্ছেন যামানা রাসূল (ﷺ) এর বাণী যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রাখে।

৪। বান্দার অন্তরে আল্লাহ্কে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধানতাবশতঃ মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন করেন এবং এ দু'টির কোন কর্মক্ষমতা নাই ফলে এ দু'টিকে গালি দেয়া তাদের পরিবর্তনকারীকে গালি দেয়ারই নামান্তর।

অধ্যায়-৪৫

কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক, প্রভৃতি) নামকরণ প্রসঙ্গ *

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, সহীহ হাদীসে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

«إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ، لا مَالِكَ إِلاَّ اللهُ»(صحيح البخاري، الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله، ح:٦٢٠٦ وصحيح مسلم، الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك . . .، ح:٢١٤٣)

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে ঘৃণিত, যার নামকরণ করা হয় 'রাজাধিরাজ' বা 'প্রভুর প্রভু'।[১] আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই।" বুখারী

সুফইয়ান সাওরী বলেছেন, 'রাজাধিরাজ' কথাটি 'শাহানশাহ' এর মতোই একটি নাম। আরো একটি বর্ণনা মতে রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

«أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ»(صحيح مسلم، الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك . . .، ح:٢١٤٣ ومسند أحمد:٢/ ٣١٥)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে ধিকৃত এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে [যার নামকরণ করা হয়েছে রাজাধিরাজ]।"[২] উল্লেখিত হাদীসে (أخنع يعنى أوضع) শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে ধিকৃত।'

---

* মানুষ নির্দিষ্ট কিছু একটার অথবা নির্দিষ্ট কোন ভূমির মালিক, কোন রাজ্যের মালিক হতে পারে ; কিন্তু সবকিছুর মালিক, সারা পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং রাজাধিরাজ শাহানশাহ্ মহাবিচারক, এ জাতীয় নাম আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্যই জায়েয নয়। কেননা তাওহীদের দাবীই হলো যে, এ ধরনে গুণে গুণান্বিত ও এ ধরনের নামে নামকরণ একমাত্র আল্লাহর জন্যেই।

১। একমাত্র আল্লাহই মহা অধিপতি, অতএব, এ ধরনের নাম মানুষের জন্য রাখার অর্থ হলো আল্লাহর জন্য যা নির্ধারিত তা গ্রহণ করা। কেননা আধিপত্য তো একমাত্র আল্লাহর আর মানুষের জন্য এ ধরনের বলা যেতে পারে যে সে অমুক জিনিসের মালিক, প্রত্যেক জিনিসের নয়। অথবা সে অমুক দেশের বাদশাহ্ বা মালিক কিন্তু সমস্ত বিশ্বের নয়। এজন্যে তাওহীদের দাবী হলো, সৃষ্টির মধ্যে কাউকে রাজাধিরাজ বলা যাবে না। বরং কোন কিতাবে যদি পাওয়া যায় তবে তা মিটিয়ে দিতে হবে।

২। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হওয়ার কারণ যে সে এই নামের দ্বারা আল্লাহর সমকক্ষ হবার জন্য নিজেকে পেশ করেছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। 'রাজাধিরাজ' নামকরণে নিষেধাজ্ঞারোপ।

২। 'রাজাধিরাজ' ব্যতীত এর সমার্থবোধক শব্দও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যেমন সুফইয়ান সাওরী 'শাহানশাহ' শব্দটি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন।

৩। উল্লেখিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪। এও বুঝা উচিত যে, ঐ সমস্ত নাম ও গুণাবলী থেকে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালারই বড়ত্ব প্রকাশ।

গ্রন্থকার (রহঃ) এখানে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে সমস্ত নামের অর্থ একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই প্রযোজ্য সেই নামে কারো নাম রাখা বৈধ নয়।

অধ্যায়-৪৬

আল্লাহ্‌র নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্মানার্থে নামের পরিবর্তন করা।*

আবু শুরাইহ্‌ হতে বর্ণিত আছে, এক সময় তার উপাধি ছিল আবু হাকাম[১] [ফয়সালাকারীর পিতা] রাসূল (ﷺ) তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেনঃ

«إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هٰذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُاللهِ، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» (سنن أبي داود، الأدب، باب تغيير الإسم القبيح، ح:٤٩٥٥ وسنن النسائي، آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم، ح:٥٣٨٩)

"আল্লাহ্‌ তা'আলাই হচ্ছেন জ্ঞানের সত্ত্বা এবং তিনিই জ্ঞানের আঁধার। তখন আবু শুরাইহ্‌ বললেন, 'আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফায়সালার জন্য আমার নিকট চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই। তা উভয় পক্ষই গ্রহণ করে। রাসূল (ﷺ) একথা শুনে বললেন, এটা কতোইনা ভাল। তোমার কি সন্তানাদি আছে? আমি বললাম, 'শুরাইহ্‌', 'মুসলিম' এবং 'আব্দুল্লাহ্‌' নামে আমার তিনটি ছেলে আছে।' তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে?'

---

* একজন তাওহীদবাদী বান্দার আল্লাহ্‌র সাথে তার অন্তরের এবং জিহ্বার (ভাষার) কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত তার বর্ণনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। আল্লাহ্‌র নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কখনও উত্তম আবার কখনও ওয়াজিব।

১। হাকাম আল্লাহ্‌র নামসমূহের অন্যতম। যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে জন্ম দেননি এবং নিজেও জন্মগ্রহণ করেননি। ফলে আবুল হাকাম অর্থাৎ হাকামের পিতা নামকরণ উচিত নয়। দ্বিতীয়ত হাকাম অর্থ হচ্ছে যিনি চূড়ান্ত বিচারক এবং যেহেতু বিচার কার্যের একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্‌র, ফলে এরূপ নামকরণ কারো জন্য জায়েয নয়। যদিও মানুষ অধিনস্থ হিসাবে বিচারক হয়ে থাকে। ফলে নবী (ﷺ) এ নামটিকে অপছন্দ করেন। সুতরাং বলব যে হাকাম অথবা হাকেম নাম না রাখাই আদাবের ব্যাপার। কিন্তু কেউ যদি বাস্তবেই আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়ন করে তবে হাকিমে নাম রাখতে তেমন কোন বাঁধা নেই।

আমি বললাম 'শুরাইহ্'। তিনি বললেন, অতএব এখন থেকে তুমি আবু 'শুরাইহ্' [শুরাইহের পিতা]।" (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর সম্মান করা। যদিও তার অর্থ উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে।

২। আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩। উপাধির জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

অধ্যায়-৪৭
আল্লাহ্, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করা।*

১। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾

অর্থঃ "আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল-তামাশা করছিলাম।"[১] (সূরা তাওবাহ, আয়াতঃ ৬৫)

ইবনে ওমর, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রাযিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধে এক লোক বললো, এ ক্বারীদের [কুরআন পাঠকারীর] মতো এতো অধিক পেটুক, কথায় এতো অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সামনে এতো অধিক ভীরু আর কোনো লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর ক্বারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আওফ বিন মালিক লোকটিকে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। কারণ, তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূল (ﷺ) কে এ বিষয়ে জানাব, আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল (ﷺ) এর কাছে চলে আসলো। তারপর গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী। [অর্থাৎ আওফ পৌঁছার পূর্বেই অহীর মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) ব্যাপারটি জেনে গেছেন।] এ ফাঁকে মুনাফিক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল (ﷺ) এর কাছে চলে আসলো। তারপর সে বললো, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মতো পরস্পরে হাসি, ঠাট্টা করছিলাম যাতে করে আমাদের পথ

---

* তাওহীদের দাবীই হলো, আল্লাহর বিধি-বিধানকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা এবং তার অনুসরণ ও সম্মান করা। পক্ষান্তরে আল্লাহ, কুরআন ও রাসূল (ﷺ) সম্পর্কিত কোন বিষয়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে তাওহীদের পরিপন্থী ও সম্মান বিরোধী। এজন্যে তা হলো বড় ধরনের কুফরী। অনুরূপ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপ করাও কুফরী। কাজেই বড় ধরনের কুফুরী সব মানুষকেই ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।

১। অত্র আয়াতের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ, নবী ও কুরআনের সাথে বিদ্রূপকারী কাফের এবং এক্ষেত্রে তার কোনই ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। অত্র আয়াতে কারীমা মুনাফেকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তাওহীদপন্থীদের দ্বারা শরীয়তের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কল্পনাতীত ব্যাপার।

চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিলো, আর সে বলছিলো, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম' তখন রাসূল (ﷺ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

﴿ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾

অর্থঃ "তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত [কুরআন] এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? তিনি তার দিকে [মুনাফিকের দিকে] দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোনো কথাও বলেননি।" (সূরা তাওবাঃ ৬৫)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। এ অধ্যায় থেকে একটি বিরাট মাসআলা প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অথবা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে কাফের।

২। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ্, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তারা কুফরী কাজ করে।

৩। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ্, কুরআন ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

৪। চোগলখুরী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠতার মধ্যে পার্থক্য।

৫। এমন কিছু অজুহাত রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

অধ্যায়-৪৮

আল্লাহ্ তায়ালার নেয়ামতের নাশোকরী করা অহংকারের লক্ষণ ও অনেক বড় অপরাধ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى ﴾

অর্থঃ "দুঃখ-দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নেয়ামত আমার প্রাপ্য।" (সূরা ফুস্‌সিলাতঃ ৫০)

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির মুজাহিদ বলেন, এটা আমারই জন্য, এর অর্থ হচ্ছে, 'আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নেয়ামত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার।'

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'সে এ কথা বলতে চায়, 'সম্পদ আমার আমলের কারণেই অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ﴾

অর্থঃ "সে বলে, নিশ্চয়ই এ সম্পদ আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।" (সূরা কাসাসঃ ৭৮)

কাতাদাহ (ﷺ) বলেন, উপার্জনের নানা পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছি। অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, 'আল্লাহ্ পাকের ইলম মোতাবেকই এ সম্পদের আমি উপযুক্ত।' মুজাহিদের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারাও বুঝানো হয়েছে যে, এ সম্পদ আমার সম্মান ও মর্যাদা সাপেক্ষে দেয়া হয়েছে।[২]

১। আলোচিত অধ্যায়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি দাবী করে, যে সব নেয়ামত ও রিযিক সে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার ফসল। অথবা যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ্‌র উপর তার প্রাপ্য হক হিসেবেই সে এসব নেয়ামতের হকদার, তাকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এ রকম ধারণা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অহংকারমূলক কথা। বান্দার আমল নিছক একটি কারণ মাত্র, কখনো এ কারণ আল্লাহর হুকুমে ফলপ্রসূ হয় আবার কখনো বিনা কারণেই মানুষের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। সুতরাং সব কিছু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুগ্রহে হয়ে থাকে।

২। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দেখা যায় যে বড় ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য হবার পর তারা পূর্বের অবস্থাকে অস্বীকার করে ও বলে নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে আমি সম্পদের মালিক হয়েছি ঠিক তেমনই অনেকে চাকুরী ও বড় পদ পেয়ে বলে আমি আমার পরিশ্রমে তা অর্জন করেছি।

আবু হুরায়রা (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (ﷺ) কে এ কথা বলতে শুনেছেনঃ

«إِنَّ ثَلاَثَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَّلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَّجِلْدٌ حَسَنٌ، وَّيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَّجِلْدًا حَسَنًا قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ أَوِ الْبَقَرُ ـ شَكَّ إِسْحَاقُ ـ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَّيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ ـ أَوِ الإِبِلُ ـ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَاملاً، وَّقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، فِيهَا فَأَتَى الأَعْمٰى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَّرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَّالِدًا، فَأَنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الإِبِلِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ وَّابْنُ سَبِيْلٍ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ ـ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ ـ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَالَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا

فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ، قَالَ: وأَتَى الأَعْمَىٰ فِيْ صُورَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِّسْكِينٌ وَّابْنُ سَبِيلٍ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ ـ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ـ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ»(صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ح:٣٤٦٤ وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، ح:٢٩٦٤)

"বনী ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিলঃ যাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, আরেকজন টাক পড়া ও অপরজন অন্ধ। আল্লাহ পাক এই তিনজনকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। কুষ্ঠরোগীর কাছে ফেরেশ্‌তা এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? সে বললো, সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক [শরীরের চামড়া]। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেশ্‌তা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে সে আরোগ্য লাভ করলো। তাকে সুন্দর রং আর সুন্দর ত্বক দেয়া হলো। তারপর ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞেস করলো 'তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বললো, 'উট অথবা গরু'। [ইসহাক অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দুয়ের মধ্যে সন্দেহ করেছেন।] তখন তাকে একটি গর্ভবতী উট দেয়া হলো। ফেরেশ্‌তা তার জন্য দু'আ করে বললেন আল্লাহ্ এ সম্পদে বরকত দান করুন।

তারপর ফেরেশ্‌তা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? 'লোকটি বললো, 'আমার প্রিয় জিনিস

হলো সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি চাই।' ফেরেশ্‌তা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ফলে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেলো। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়?' সে বললো, 'উট অথবা গরু।' তখন তাকে গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। ফেরেশ্‌তা তার জন্য দু'আ করে বললো, 'আল্লাহ্ এ সম্পদে বরকত দান করুন।

তারপর ফেরেশ্‌তা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বললো, 'তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি?' লোকটি বললো, 'আল্লাহ্ যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাবো, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।' ফেরেশ্‌তা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে লোকটির দৃষ্টি আল্লাহ্ পাক ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশ্‌তা তাকে বললেন, 'কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়?' সে বললো, 'ছাগল আমার বেশি প্রিয়।' তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হলো। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেলো, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

একদিন ফেরেশ্‌তা তার দ্বিতীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠরোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি একজন মিসকিন।' আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে [আমি খুবই বিপদগ্রস্ত] আমার গন্তব্যে পৌছার জন্য প্রথমে আল্লাহ্‌র অতঃপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ্ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি। তখন লোকটি বলল, দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে, ফেরেশ্‌তা বললো, আমার মনে হয় আমি আপনাকে চিনি। আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না, লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করতো এবং আপনি খুব গরীব ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বললো, এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশ্‌তা তখন বললেন, 'তুমি যদি

মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

তারপর ফেরেশ্তা টাক মাথা ওয়ালা লোকটির কাছে গেলো এবং ইতিপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিলো, তার [টাক ওয়ালা লোকটির] সাথেও সে ধরনের কথা বললো। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরনের উত্তর দিয়েছিলো, এ লোকটিও সেই একই ধরনের উত্তর দিলো। তখন ফেরেশ্তাও আগের মতই বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ পাক যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।' অতঃপর ফেরেশ্তা দ্বিতীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্র অতঃপর আপনার সাহায্য দরকার। যিনি আপনার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি ছাগল আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার এই সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারি। তখন লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ পাক আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আপনার যা খুশী রেখে যান। আল্লাহ্র কছম, আল্লাহ্র নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দু মাত্র আমি বাধা দিব না। তখন ফেরেশ্তা বললো, আপনার মাল আপনিই রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গীদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"[৩] (বুখারী ও মুসলিম)

৩। আবু হুরায়রা (ﷺ) এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ উক্ত তিন ব্যক্তিকেই সুস্থ্যতা দান করেছিলেন ; কিন্তু দু'জনই সকল নেয়ামত ও সম্পদকে নিজেদের দিকে সম্পর্কিত করেছিলো। আর তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কিত করেছিল আল্লাহর দিকে, তাই তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছিলেন ও তার প্রতি তার নেয়ামতকে স্থায়ী করেছিলেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি প্রদান করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ যে, অনুগ্রহ করার পর তিনি তার নেয়ামতকে স্থায়ী করেন। আবার ইচ্ছা করলে ফেরত নেন। নেয়ামত স্থায়ী করণের উপায় হচ্ছে যে, বান্দা তার বড়ত্ব বর্ণনা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, সমস্ত অনুগ্রহই আল্লাহ্র হাতে। পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ হচ্ছে যে বান্দা বিশ্বাস করবে যে সে আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে সে কোন কিছুই হকদার নয় বরং আল্লাহ্ই প্রতিপালক এবং সকল প্রকার ইবাদত, কৃতজ্ঞতা ও মহত্বের উপযুক্ত। অতএব তাঁকে স্মরণ করতে হবে ও নেয়ামত সমূহ তাঁরই দিকে সম্পর্কিত করতে হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা ফুস্‌সিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। ﴿لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾ এর অর্থ।

৩। ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓ﴾ এর অর্থ।

৪। বর্ণিত এই বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে নিহিত বিরাট উপদেশাবলী।

অধ্যায়-৪৯

সন্তানাদি পাওয়ার পর আল্লাহর সাথে অংশীদার করা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

অর্থঃ "অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল সন্তান দান করলেন তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর অংশীদার তৈরি করতে লাগল। কিন্তু তারা যাকে অংশী স্থাপন করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান।" (সূরা আ'রাফঃ ১৯০)

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, মুফাস্সিরীনগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহ্র ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমনঃ আবদু ওমর, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে 'আব্দুল মুত্তালিব' এর ব্যতিক্রম।[১]

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আদম (عليه السلام) যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বললো, 'আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় হরিণের শিং গজিয়ে দিবো, তখন সন্তান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই এ কাজ করে ছাড়বো, আমি অবশ্য এ কাজ করে ছাড়বো।

১। উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, বান্দা শব্দের নামের সম্বোধন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দিকে হারাম বরং তা সকল নবীর শরীয়তে হারাম ছিলো। কেননা এখানে নিয়ামতের সম্পর্ক গাইরুল্লাহ্র দিকে হয়ে যায়, তাছাড়াও আল্লাহ্র সাথে আদবের ও বরখেলাফ। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আব্দুল মুত্তালিব নামের বৈধতা ও অবৈধতা প্রশ্নে উলামায়ে কেরাম একমত হননি। কেউ কেউ বলেছেন আব্দুল মুত্তালিব নামটি মাকরূহ কিন্তু হারাম নয়। কিন্তু এটা সঠিক নয় এবং এ নামের বৈধতার সপক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয় তাও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা নবী (ﷺ) এর কথা 'আমি মিথ্যুক নবী নই আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।' এটা শুধু তিনি অবস্থার খবর দিয়েছেন বৈধ ও অবৈধের বিধান দান করেন নাই। এতে মাখলুকের জন্য উবূদিয়াতের সম্পর্ক নির্ধারণ করেননি। সাহাবায়ে কেরাম যে আব্দুল মুত্তালিবের নামে কারো কারো নাম রেখেছিলেন তা মূলতঃ ভুল বর্ণনা করা হয়েছে বরং তারা নাম রেখেছিলেন মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিব নয়।

শয়তান এভাবে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বললো, 'তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আবদুল হারিছ' রেখো।'[২] তখন তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো, তারা উভয়েই শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতপর একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। বিবি হাওয়া আবারও গর্ভবতী হলেন শয়তান তাদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো, এর ফলে তাঁদের অন্তরে সন্তানের ভালবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিলো। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিছ' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ব নেয়ামতের মধ্যে তাঁর সাথে শরীক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে আয়াতের তাৎপর্য। (ইবনে আবি হাতেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

কাতাদাহ সহীহ্ সনদে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।

মুজাহিদ থেকে সহীহ্ সনদে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, আল্লাহর বাণীঃ

﴿ جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ﴾

আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেনঃ 'সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আশংকা তাঁরা [পিতা-মাতা] করেছিলেন।

হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকে এর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

২। উক্ত ঘটনায় আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সন্তান পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, তাঁরা সন্তানের নাম আব্দুল হারেছ রাখলেন। আর হারেছ হচ্ছে ইবলিসের নাম এর পূর্বেও ইবলিস তাদের দু'জনকে (আদম ও হাওয়া আঃ) দু'দুবার ধোকা দিয়েছিলেন। যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং সালাফে সালেহীনদের নিকটও স্বীকৃত। তারা উভয়ই ইবলিসকে যে শরীক করেছিলেন তা মূলতঃ ইবাদতে নয় বরং অনুকরণে যেটা সগীরা গুনাহ এবং নবীদের দ্বারা সগীরা গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। অতএব এ থেকে এও বুঝা গেল যে, প্রত্যেক পাপী শয়তানের অনুসরণ করে থাকে, আর বান্দার দ্বারা যে পাপ হয়ে থাকে তা অনুসরণমূলক শিরকের কারণে হয়ে থাকে। উক্ত ঘটনায় তাঁদের না মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না এর দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁরা আল্লাহর সাথে শিরক করেছিলেন। আহলে ইলমদের নিকট একথা বিদীত যে নবীদের দ্বারা ছোট্ট পাপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয় তবে নিশ্চয়ই তারা উক্ত পাপে স্থায়ী থাকেন না ; বরং তারা তা থেকে যথা শিঘ্রই ফিরে যান ও আল্লাহর নিকট তওবা করেন এবং এ ধরনের পাপের কারণে তাঁদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় আরো বেশি হয়ে যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে, সে সব নাম রাখা হারাম।

২। সূরা আ'রাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকীকত [অর্থাৎ শিরক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্তান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নিয়ামতের বিষয়।

৫। আনুগত্যের মধ্যে ও ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালফে সালেহীন পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অধ্যায়-৫০
আসমাউল হুসনা-এর বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী--

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ্‌র অনেক সুন্দর নাম রয়েছে।* এসব নামে তোমরা তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ *করো।"[১] (সূরা আ'রাফঃ ১৮০)*

ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, 'তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করে' এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

ইবনে আব্বাস আরো বর্ণনা করেন, মুশরিকরা 'ইলাহ' থেকে 'লাত' আর আযীয থেকে 'উয্‌যা' নামকরণ করেছে।

---

* আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্ত্বার জন্য যা ঘোষণা করেছেন তাই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা, অথবা তাঁর রাসূল তার (আল্লাহ্‌র) জন্য যেসব সুন্দর সুন্দর নামের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো স্বীকার করে নেয়া। সাথে সাথে এসব সুন্দর নামের মধ্যে যে সুমহান অর্থ ও পরিচয় নিহিত আছে তা অনুধাবন করা এবং এসব নামের দ্বারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও তার কাছে দু'আ করা। উক্ত আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হলো, আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহে ইলহাদকারীদের থেকে দূরে থাকা।

১। আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বিকৃতি বা নামগুলোকে স্বীয় উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে ভিন্ন অর্থে প্রবাহিত করাকে আল্লাহ্‌র নামের ও গুণের ইলহাদ বলা হয়। আল্লাহ্‌র নামের ইলহাদ এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যেমন মানুষ আল্লাহ্‌র নামে উপাস্যদের নাম রাখে। যেমন- তারা নাম রেখেছিল ইলাহ্ শব্দ থেকে লাত আযীয শব্দ থেকে উয্‌যা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র নামে ইলাহাদের অংশ খ্রিস্টানদের ন্যায় আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা ও গুণাবলী বা এর কিছু অংশ অস্বীকার করা। যেমন- জাহমিয়ারা করে থাকে, তারা আল্লাহ্‌র কোন নাম ও গুণেই বিশ্বাস করে না, শুধু আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বিশ্বাস করে। ইলহাদের অংশ এই যে, আল্লাহ্‌র নামের ও গুণের বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে এমন অর্থ প্রকাশ করা যা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে সালাফে সালেহীন-সুমহান উত্তরসূরীদের আকীদা হলোঃ আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান রাখতে হবে এবং সেগুলোর অপব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ করা জায়েয নয়। যেমন- মু'তাযিলা, আশায়েরা, মাতুরিদিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরা করে থাকে। এক্ষেত্রে মোটকথা হচ্ছে ইলহাদ কুফুরী এবং তার কিছুটা হচ্ছে বিদ'আত।

আ'মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু [শিরকি বিষয়] ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র নামগুলোর যথাযথা স্বীকৃতি।

২। আল্লাহ্‌র নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।

৩। সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লাহ্‌কে ডাকার নির্দেশ।

৪। যেসব মূর্খ ও বেঈমান লোকেরা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।

৫। ইলহাদ তথা নাস্তিকতার ব্যাখ্যা।

৬। আল্লাহর নামে বিকৃত ঘটানোর বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শন।

অধ্যায়-৫১

আল্লাহ্‌র উপর শান্তি বর্ষিত হোক* বলা যাবে না।

সহীহ্ বুখারীতে ইবনে মাসউদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে নামাযে রত ছিলাম। তখন আমরা বললামঃ

«اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَّفُلَانٍ»

"আল্লাহ্‌র উপর তাঁর বান্দাহদের পক্ষ থেকে শান্তি হোক, অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" তখন রাসূল (ﷺ) বললেনঃ

«لاَ تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ»(صحيح البخاري، الأذان، باب التشهد في الآخرة، ٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠ وصحيح مسلم، الصلاة، باب التشهد في الصلوة، ح:٤٠٢)

"আল্লাহ্‌র উপর শান্তি হোক, এমন কথা তোমরা বলো না।[১] কেননা আল্লাহ্ নিজেই 'সালাম' [শান্তি]।"

---

* 'আল্লাহ্‌র উপর শান্তি বর্ষিত হোক' এ জাতীয় কথা বললে তাওহীদে ঘাটতি দেখা দেবে, কেননা আল্লাহ্ কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ এক মহান সত্ত্বা কিন্তু সকল বান্দাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণীঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

অর্থঃ "হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী ; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (সূরা ফাতিরঃ ১৫)

১। সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ভাবে আল্লাহর শানে সালাম অভিবাদন হিসেবে বলে ছিলেন। আর সালাম এ শরীয়তে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব বান্দর পক্ষা থেকে আল্লাহর প্রতি সালাম প্রদানের অর্থ হলো, তাঁরা যেন বলেছেনঃ আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম বর্ষিত হোক, এই অর্থ যদিও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সঠিক কিন্তু শব্দগত ভাবে তা সঠিক নয়। কেননা এখানে আল্লাহর প্রতি সালামের অর্থ দাঁড়ায়ঃ আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক, আর একথা নিঃসন্দেহে বাতিল-ভ্রান্ত ও আল্লাহর সাথে বেআদবী ও জঘন্য আচরণ এবং তাওহীদ পরিপন্থী। এজন্যেই নবী (ﷺ) এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এই নিষেধ হারাম সূচক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ‘সালাম’ এর ব্যাখ্যা।

২। ‘সালাম’ হচ্ছে সম্ভাষণ।

৩। এ [‘সালাম’] সম্ভাষণ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ‘সালাম’ প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।

৫। বান্দাহ্‌গণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্‌র জন্য সমীচিন ও শোভনীয় নয়।

অধ্যায়-৫২

হে আল্লাহ্ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো।*

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরা (ﷺ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ»(صحيح البخاري، الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، ح:٦٣٣٩، ٧٤٦٤ وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح:٢٦٧٩)

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, 'হে আল্লাহ্, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, 'হে আল্লাহ্, 'তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা করো।' বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ্র উপর জবরদস্তি করার মতো কেউ নেই।"[১] বুখারী

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে–

«وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»(صحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح:٢٦٧٩)

"আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিত। কেননা আল্লাহ্ বান্দাহ্কে যা-ই দান করেন না কেন তার কোনোটাই তাঁর

---

* 'হে আল্লাহ্ তুমি চাইলে আমাকে মাফ করো' এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগকারীর আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা পাবার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই এবং তার মধ্যে বিনীত কোন ভাবও নেই। এটা অহংকারীদের এবং বিমুখতা অবলম্বনকারীদের কাজ। বান্দা তার রবের কাছে মনযোগ ও দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে এবং সে অত্যান্ত বিনীতভাবে তার প্রয়োজন ও ক্ষুধার্তভাব প্রকাশ করবে এবং তাঁর অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও ক্ষমার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হবে।

১। দৃঢ়প্রত্যয়ই মুখাপেক্ষী ও বিনীতভাবে আল্লাহ্র কাছে চাইবে, অহংকারী ও মুখাপেক্ষীহীনের মত নয়। নবী (ﷺ) এর বাণীঃ "فـإن الله لا مكـره لـه" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীনতা, পরিপূর্ণ মর্যাদাবান ও পরাক্রমশীল হওয়ার জন্য এমন কেউ নেই যে, তাঁকে কেউ বাধ্য করবে। আর এ হলো, তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত।

কাছে বড় কিংবা অসম্ভব নয়।"[২]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। দু'আয় কোন শর্ত করা নিষিদ্ধ।

২। কোন শর্ত করা নিষিদ্ধ তার কারণ বর্ণনা করা।

৩। প্রার্থনা করার বিষয়ে সংকল্প রাখা।

৪। প্রার্থনা করার সময় উৎসাহ থাকা।

৫। দু'আয় উৎসাহ দেখানোর কারণ।

২। নবী (ﷺ) এর বাণী "ইন্‌শাআল্লাহ্ আরোগ্য লাভ করবে।" (রোগীদের সামনে) মূলতঃ দু'আ নয়। বরং এটা খবর দেয়ার প্রসঙ্গ অর্থাৎ ইন্‌শাআল্লাহ্ আরোগ্য লাভ হবে। সুতরাং পূর্বের বিধান থেকে এটি আলাদা হওয়া সুস্পষ্ট।

অধ্যায়-৫৩

আমার দাস-দাসী বলা যাবে না*

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىءِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي»(صحيح البخاري، العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ح:٢٥٥٢ وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، ح:٢٢٤٩)

"তোমাদের কেউ যেন না বলে, তোমার রবকে খানা খাওয়াও', 'তোমার রবকে অযূ করাও।'[১] বরং সে যেন বলে, 'আমার নেতা, আমার মনিব।' তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'আমার দাস, আমার দাসী। বরং সে যেন বলে, 'আমার ছেলে, আমার মেয়ে আমার চাকর।"

---

* 'আমার দাস-দাসী' বলা যাবে না। কেননা দাসত্ব তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য। 'যদি কেউ বলে এটা আমার দাস বা দাসী তখন সে দাসত্বের সম্পর্ক নিজের দিকে করল যা আল্লাহ্র সাথে আদবের সম্পূর্ণ বরখেলাপ এবং আল্লাহ্র রুবুবিয়াতের বড়ত্বের পরিপন্থী, আর মাখলুকের উবুদিয়াত-দাসত্ব যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য তার বিনাশ সাধন করে। এজন্য অধিকাংশ উলামার নিকট এ শব্দ প্রয়োগ করা নাজায়েয তবে কতিপয় তা মাকরূহ বলেছেন।

১। রব না বলা প্রসঙ্গে 'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে এ নিষেধাজ্ঞা কি ধরনের কেউ বলেছেন এটা হারাম আবার কেউ বলেছেন এটা মাকরূহ কেননা এটা শুধু আদবের কারণে নিষেধ করা হয়েছে ; কিন্তু নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে যে এটা হারাম। কিন্তু রব এর সম্বোধন এমন বস্তুর দিকে করা যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ নেই। যেমন- (رب الدار) অর্থাৎ গৃহের রব বা মালিক সাইয়্যেদ যদিও আল্লাহ্ নিজেই কিন্তু সম্বোধনের সাথে অর্থাৎ আমার সাইয়্যেদ ইত্যাদিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে উবুদিয়াত-দাসত্বের ধারণা আসা অসম্ভব কিন্তু আনুপাতিক হারে বান্দার জন্য ও সিয়াদত বা নেতৃত্ব মানা যায়। পক্ষান্তরে সমগ্র মাখলুকের উপর আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব প্রমাণিত।

হে আমার মাওলা প্রসঙ্গঃ মাওলা শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে তবে সাইয়্যেদ ও মাওলা শব্দ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয, কেননা এখানে আনুপাতিক হারে অর্থ দাঁড়াবে। অর্থাৎ মাখলুকের জন্য এর ব্যবহার নিতান্তই সীমিত ও তার অবস্থান ও মর্যাদা সাপেক্ষে অনুরূপ আল্লাহ্র জন্য এর অর্থ হবে তাঁর মহত্ব, অসীমত্ব ও মর্যাদা সাপেক্ষ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আমার দাস-দাসী বলা নিষিদ্ধ।

২। কোনো গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, 'আমার রব'। এ কথাও যেন না বলে, 'তোমার রবকে আহার করাও'।

৩। প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হলো, "আমার ছেলে", 'আমার মেয়ে', 'আমার চাকর' বলতে হবে।

৪। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আমার নেতা', 'আমার মনিব' বলতে হবে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

অধ্যায়-৫৪
আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা*

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»(سنن أبي داود، الزكاة، باب عطية من سأل بالله، ح: ١٦٧٢ وسنن النسائي، الزكاة، باب من سأل بالله عزوجل، ح: ٢٥٦٨)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।[১] যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দু'আ করো, যার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

---

* আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রার্থনা করা হলে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান রক্ষার্থে প্রার্থনাকারীকে বিমুখ করা বৈধ হবে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) সহ অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন যখন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নির্দিষ্ট কারো নিকট নির্দিষ্ট কিছু চাইবে আর সে তা প্রদান করতে সমর্থ রাখে তখন বিমুখ করা হারাম হবে। আর যখন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অনির্দিষ্ট কারো নিকট কিছু চাইবে তখন তাকে দেয়া উত্তম হবে এবং যদি জানা যায় যে উক্ত প্রার্থনাকারী মিথ্যাবাদী কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে চাই তবে তাকে দেয়া জায়েয।

১। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চাওয়া সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উসীলা। কেউ ডাকলে সাড়া দিতে হবে এটা বিশেষ করে ওলীমার দাওয়াতের ক্ষেত্রে। প্রতিটি দাওয়াতে নয়। তবে সকল দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারলে তা উত্তম হবে। উল্লেখিত হাদীসে এ শিক্ষাও বিদ্যমান যে, কেউ যদি কারো প্রতি সদ্ব্যবহার করে তবে তার প্রতিদানে অপারগতা প্রকাশ না করে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তারপরেও যদি প্রতিদান দেয়া সম্ভব না হয় তবে তার জন্য কমপক্ষে এমন দোয়া করবে যাতে বুঝা যায় যে, সে তার প্রতিদান দিল। অবশ্য এ স্থান অর্জন করতে একমাত্র প্রকৃত পরহেযগার ও তাওহীদপন্থী ব্যক্তিরাই পারবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে আশ্রয় দান।

২। আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩। নেক কাজের আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৪। ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫। ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দু'আ করা।

৬। এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দু'আ করা, যাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়-৫৫

'বি ওয়াজহিল্লাহ্' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না।*

জাবের (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ»(سنن أبي داود، الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله عزوجل، ح:١٦٧١)

"বিওয়াজহিল্লাহ্ [আল্লাহ্র চেহারার উসীলা] দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাইবে না।"[১] (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত "বিওয়াজহিল্লাহ" দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২। আল্লাহ্র 'চেহারা' নামক সিফাত বা গুণের স্বীকৃতি।

---

* আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আল্লাহ্র চেহারার উসীলায় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া বৈধ হবে না।

১। চেহারা আল্লাহ্র সত্ত্বাগত গুণাবলীর একটি। যা তাঁর উপযোগী পর্যায়েই সাব্যস্ত ও প্রমাণিত কিন্তু তার কাইফিয়াত বা রকম সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানেন তবে তার প্রতি আমরা বিশ্বাস করবো কোন প্রকার উদাহরণ ছাড়াই এবং তা অকেজো ধারণা না করা। কেননা আল্লাহ্ বলেন- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ তার সাদৃশ্য কেউ নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

আল্লাহ্র নামে বা তার গুণাবলী দ্বারা সামান্যতম ও নিকৃষ্টতম কোন জিনিস চাওয়া বৈধ হবে না। বরং বড় বড় বিষয় যেমন জান্নাত চাওয়া সমীচীন হবে। এ অধ্যায়ে যেন আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলীর মহত্ত্বের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫৬

বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা*

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ﴾

অর্থঃ "তারা বলছিল আমাদের হাতে 'যদি' কিছু করার থাকত তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।"[১] (সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৪)

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ﴾

অর্থঃ 'ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাই সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত তবে নিহত হতো না।" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৬৮)

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (صحيح

---

* গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায় রচনা করেছেন কেননা অনেকেই তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাকদীরের উপর আক্ষেপ করে বলে যে আফসোস যদি এমন করতাম তবে এমন হতো না। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ই তো সমস্ত কৃতকর্ম ও তার ফলাফল নির্ধারক। অতএব, সবকিছু তাঁরই ফয়সালাতে ঘটে থাকে।

১। তারা (মুনাফিকগণ) বলে যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন কথা রাখা হতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। 'যদি' শব্দটি যখন অতীতের জন্য ব্যবহার করা হবে তখন তা না জায়েয ও হারাম হবে কেননা তা প্রমাণ করে যে "যদি" শব্দটি বাক্যে প্রয়োগ করা হলো মুনাফেকের আলামত, তাই ব্যবহার করা হারাম। "যদি"র ব্যবহার অন্তরকে দুর্বল ও অপারগ করে দেয় ; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য 'যদি' ব্যবহার আল্লাহ্র রহমত ও কল্যাণের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হলে তখন তা বৈধ হবে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেই অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ করতঃ হয় তবেও নাজায়েয। কেননা এতে তাকদীরের প্রতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পায়।

مسلم، القدر، باب الإيمان بالقدر والإذعان له ح:٢٦٦٤ ومسند أحمد:٢/٣٦٦،
٣٧٠)

"যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তুমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ো, তবে এ কথা বলো না, 'যদি আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো।' বরং তুমি এ কথা বলো, 'আল্লাহ্ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।" বুখারী

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা আল-ইমরানের ১৫৪নং আয়াত এবং ১৬৮নং আয়াতের উল্লেখিত অংশের তাফসীর।

২। কোন বিপদাপদ হলে 'যদি' প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

৩। শয়তানের [কুমন্ত্রণামূলক] কাজের সুযোগ তৈরিকরণ।

৪। উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৫। উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য কামনা করা।

৬। এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা।

অধ্যায়-৫৭

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ*

উবাই ইবনে কা'ব (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করো তখন তোমরা বলোঃ

«اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ»(جامع الترمذي، الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، ح:٢٢٥٢)

"হে আল্লাহ্ এ বাতাসের মধ্যে যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল আছে এবং যতোটুকু কল্যাণ করার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে ততোটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থণা করি। আর এ বাতাসের মধ্যে যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে এবং যতোটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে আদিষ্ট হয়েছে তা [অমঙ্গল ও অনিষ্টতা] থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"[১] [তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

---

* বাতাসকে গালি দেয়া 'যুগকে গালি দেয়ার মত।' বাতাসকে গালি দেয়া হারাম। কেননা যেভাবে ইচ্ছা বাতাস নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন স্বয়ং আল্লাহ্, তাই বাতাসকে গালি দাতার গালি প্রকৃতপক্ষে বাতাসের নিয়ন্ত্রকের উপরই বর্তায়। ফলে বাতাসকে গালি দেয়া হারাম। তবে তার ধ্বংস যজ্ঞ ও প্রবাহের গতি এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

১। لا تسبوا الريح এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, বাতাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহরই এবং তাঁরই আদেশের অধীন এ জন্য নবী (ﷺ) অপছন্দমূলক বাতাস প্রবাহের প্রাক্কালে হাদীসে বর্ণিত দোয়া পড়ার নির্দেশ দেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। মানুষ যখন কোনো অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথা বলবে, তার নির্দেশনা।

৩। বাতাস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট, একথার দিক নির্দেশনা।

৪। বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

অধ্যায়-৫৮

আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা সম্পর্কে খারাপ ধারণার নিষিদ্ধতা

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে।"* (সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৪)

আল্লাহ্ পাক আরো ইরশাদ করেনঃ

﴿ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ ﴾

অর্থঃ "যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করেন,[১] তাদের জন্য মন্দ

---

* আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাত ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর পূর্ণতার চাহিদা হচ্ছে যে তিনি উচ্চতর হিকমাত সম্মত কারণ ছাড়া কোন কার্য সম্পদন করেন না। আর হিকমাত হলোঃ উত্তম উদ্দেশ্য সাপেক্ষ কার্যাবলীকে তার যথাস্থানে রাখা। ফলে তাঁর কামালিয়াতের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর ব্যাপারে হক কথা বলা ও সঠিক ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব। অনুরূপ তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাত, রহমত ও ইনসাফের দাবী হলো জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় তার ব্যাপারে কোন রূপ খারাপ ও অসম্পূর্ণতার ধারণা না করা যা তাওহীদের মূলনীতির পরিপন্থী বা তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। তারা ধারণা করত যে আল্লাহ্র কার্যসমূহ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ফলে তারা শিরকে জড়িয়ে পড়ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের কথার উল্লেখ করেছেন, তারা বলে আমাদের কি কোন কথা রাখা হবে? অথচ তাদের এ কথায় হিকমাত এবং তাকদীরকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

১। 'তারা [মুনাফিকরা] আল্লাহ্র সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত'। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, সালফে সালেহীন এই খারাপ ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা তিন রকম ধারণা করতঃ **প্রথমটি** তাকদীর তথা ভাগ্যকে অস্বীকার করতঃ **দ্বিতীয়টি** প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্ হিকমত নিহিত আছে তা অস্বীকার করত, **তৃতীয়টি** আল্লাহ্ যে তাঁর রাসূলকে তাঁর দ্বীনকে এবং তাঁর নেক বান্দাদের সাহায্য করেন তা অস্বীকার করত।

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেছেনঃ এর ব্যাখ্যা হলো যে, মুনাফিকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যায় আরোও বলা হয়েছে যে, নবী (ﷺ) এর উপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহ্র ফায়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্র হিকমত, তাকদীর, রাসূল (ﷺ) এর পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহ্র দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা সূরা 'ফাতহে' উল্লেখিত মুনাফিক ও মুশরিকরা পোষণ করতো। এ জাতীয় বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাকের সুমহান মর্যাদার জন্য এটা শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত, প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমূলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ্ পাক বাতিলকে হকের উপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ফায়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহ্র এক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবীদার একথা অস্বীকার করে, সাথে সাথে এ দাবীও করে যে, এসব আল্লাহ্ পাকের নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র ; তার এ ধারণা কাফেরদের ধারণা সমতুল্য। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি এ সব কাফেরদের জন্যই অবধারিত রয়েছে। অধিকাংশ লোকই নিজেদের [সাথে সংশ্লিষ্ট] বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ্ পাকের ফায়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক তাঁর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্র প্রতি এ জাতীয় খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।[২]

২। আল্লাহ্র প্রতি খারাপ ধারণা থেকে শুধুমাত্র তারাই পরিত্রাণ পায় যারা আল্লাহ্ ও তার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে এবং তাঁর হিকমাত ও হাম্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। যারা আল্লাহ্র প্রতি খারাপ জ্ঞান লাভ করেছে, আল্লাহ্র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে তারা তাদের আল্লাহ্র নিকট তাওবা ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, অনেককে দেখা যায় বাহ্যিকভাবে তারা আল্লাহ্র প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে মুক্ত, কিন্তু মনের দিক থেকে তারা পরিষ্কার হতে পারেনি। ফলে তাদের আল্লাহ্র নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা জরুরী। এমনকি সে যদি বড় ধরনের বিপদেও আক্রান্ত হয় তবুও ধারণা করতে হবে যে আল্লাহ্ হক এবং তাঁর সমস্ত কার্যাবলী হক।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং নিজের মঙ্গল কামনা করে, তার উচিত এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তার উচিত নিজ ভ্রান্ত ধারণার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা।

আল্লাহ্‌র প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণকারী কোনো ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা করো, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধীতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে কেউ বেশি, কেউ কম বলে থাকে। তুমি তোমাদের নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো, তুমি কি খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত?

কবির ভাষায়–

মুক্ত যদি থাকো তুমি এ খারাবী থেকে,

বেঁচে গেলে তুমি এ মহাবিপদ থেকে,

আর যদি নাহি পারো ত্যাগিতে এ রীতি,

বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি ॥

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা আল-ইমরানের ১৫৪নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা 'ফাত্হ' এর ৬নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আস্মা ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলী] এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

অধ্যায়-৫৯

তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিচিতি *

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেছেনঃ "কসম সেই সত্ত্বার, যার হাতে ইবনে ওমরের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারকারীদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনে।"[১] অতঃপর তিনি রাসূল (ﷺ) এর বাণী দ্বারা তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন–

«اَلإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ح:٨)

"ঈমান বলতে বুঝায় এই যে, তুমি আল্লাহ্ পাক, তাঁর সকল ফেরেশ্‌তা, তাঁর যাবতীয় [আসমানী] কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি

---

* তাকদীর তথা ভাগ্যের প্রতি ঈমান বলতে বুঝায় যে প্রত্যেক বিষয়ই আল্লাহ্‌র পূর্ব হতেই জ্ঞান আছে বিশ্বাস করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সবকিছুই তিনি লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তা বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস করা যে তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন এবং তিনি বান্দার সমস্ত কর্মের স্রষ্টা তা বিশ্বাস করা। আল্লাহ্ বলেন 'আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসেরই স্রষ্টা' আল্লাহ্ বান্দা ও তাদের কর্মের স্রষ্টা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাকে মুমিন বলা হবেনা কেননা এক্ষেত্রে অনেক দলীল রয়েছে। তাকদীরকে অস্বীকার করা কখনও ইসলাম থেকে বহিষ্কারের কারণ হয়। যেমন কেউ যদি আল্লাহ্‌র পূর্ব হতে জ্ঞান রাখেন অস্বীকার করে অথবা আল্লাহ্‌র লাওহে মাহ্‌ফুজে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন তা অস্বীকার করে। তাকদীরকে অস্বীকার করা কখনও বিদ'আতের পর্যায় যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী ; যেমন- আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা তার সৃষ্টির ব্যাপারে যে ব্যাপকতা কেউ যদি অস্বীকার করে।

১। ইবনে উমার (রাঃ) এভাবে বলার কারণ হলো, আল্লাহ্ তায়ালা শুধু মুসলমানের নিকট থেকেই সৎ আমল সমূহ কবূল করেন। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখেনা সে বরং অস্বীকার করে সে নিশ্চয়ই মুসলমান নয়। যদিও সে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। তিনি তাঁর কথার সমর্থনে নবী (ﷺ) এর উক্ত হাদীস পেশ করেন। তাকদীরের ভাল-মন্দ বলতে বান্দার স্বার্থে ভাল-মন্দের কথা বলা হয়েছে। যদিও আল্লাহ্‌র কর্ম সবই ভাল এবং হিকমতের অন্তর্গত ও অনুযায়ী।

ঈমান রাখবে। সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান স্থাপন করবে।" (মুসলিম)

উবাদা বিন সামেত (ﷺ) বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, 'হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব লাভে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনো দিন তোমার জীবনে ঘটার ছিল না। রাসূল (ﷺ)-কে একথা আমি বলতে শুনেছিঃ

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, 'লিখ'।[২] কলম বললো, 'হে রব, 'আমি কি লিখবো?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো।"

হে বৎস রাসূল (ﷺ) কে আমি বলতে শুনেছিঃ

«مَنْ مَّاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّي»(سنن أبي داود، السنة، باب في القدر، ح: ٤٧٠٠)

"যে ব্যক্তি [তাকদীরের উপর] বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলো, সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়।"

ইমাম আহমদের অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে–

২। তাকদীরের ব্যাপারে উবাদাহ বিন সামেতের হাদীসের মর্ম হলোঃ তাকদীরের সব কিছু লিখা হয়ে গেছে। তাকদীরের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য হলো, মানুষ কার্যাবলী সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বাধ্য নয় বরং তার স্বাধীনতা রয়েছে, সে তার ইচ্ছামত ভাল বা মন্দ কাজ করতে পারে। এই জন্যই তাকে নেকী করার আদেশ ও গুনাহ থেকে বাঁচার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি বাধ্যই হতো তবে তাকে নিদের্শ নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিলনা। 'আল্লাহ্ তাকে (কলমকে) বললেন লেখ।' অত্র হাদীস দ্বারা লেখার গুরুত্ব প্রমাণিত হয় এবং 'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে কলম' গবেষক উলামাদের এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হচ্ছে যে আল্লাহ্ যখন কলম সৃষ্টি করলেন তখন তাকে এ কথা বললেন এমন নয় যে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলমই সৃষ্টি করেছেন। কেননা তার প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আরশ।

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(مسند أحمد: ٥/٣١٧)

"আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন 'কলম'। এরপরই তিনি কলমকে লক্ষ্য করে বললেন, লিখ।' কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সে মুহূর্ত থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল। (আহমাদ)

ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«فَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ»(أخرجه ابن وهب في "القدر" رقم(٢٦) وابن أبي عاصم في "كتاب السنة"، ح: ١١١

"যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ বিশ্বাস করেনা, তাকে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।"

ইবনু দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি ইবনে কা'ব এর কাছে গেলাম। তারপর তাকে বললাম, 'তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তর থেকে উক্ত জমাট বাঁধা কথা দূর করে দিবেন। তখন তিনি বললেনঃ

«لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هٰذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(سنن أبي داود، السنة، باب في القدر، ح: ٤٦٩٩ ومسند أحمد: ٥/ ١٨٢، ١٨٥، ١٨٩).

"তুমি যদি উহুদ [পাহাড়] পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্র রাস্তায় দান করো, আল্লাহ্ তোমার এ দান ততক্ষণ কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর একথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে কখনো ব্যতিক্রম হতো না। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনো দিন তোমার জন্য ঘটার ছিল না। তুমি যদি তাকদীর সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তা হলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।"

তিনি বললেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন সাবিত (রাযিআল্লাহু আনহুম) এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল (ﷺ) থেকে এ জাতীয় হাদীস এর কথাই উল্লেখ করেছেন। (হাকিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরয এর বর্ণনা।

২। তাকদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে, এর বর্ণনা।

৩। তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই, তার আমল বাতিল।

৪। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনেনা সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।

৫। আল্লাহ সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।

৬। কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, উক্ত সময়েই তা লিখা হয়ে গেছে।

৭। যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস করেনা, তার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর কোন দায়িত্ব নেই।

৮। সালফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞ জনকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।

৯। ওলামায়ে কেরাম এমনভাবে প্রশ্নকারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যেতো। জবাবের নিয়ম এই যে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল (ﷺ) এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পর্কিত করতেন।

অধ্যায়-৬০

ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম*

আবু হুরাইরা (ﷺ) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»(صحيح البخاري، اللباس، باب نقض الصور، ح:٥٩٥٣، ٧٥٥٩ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . .، ح:٢١١١)

"আল্লাহ্ পাক বলেন, 'তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অনু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবের দানা তৈরি করুক।'[১] (বুখারী ও মুসলিম)

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ» (صحيح البخاري، اللباس، باب ما وطىء من التصاوير، ح:٥٩٥٤ وصحيح مسلم، اللباس، تحريم تصوير صورة الحيوان. . .، ح:٢١٠٧)

---

* ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাত দ্বারা কোন জিনিসের নির্ধারিত আকৃতি ও পদ্ধতিতে তৈরি কারীকে চিত্র শিল্পী বলে। ছবি অঙ্কন মূলতঃ দু'কারণে হারাম। **প্রথমটি** হচ্ছে প্রাণীর ছবি অঙ্কন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে সৃষ্টি বিষয়ে সাদৃশ্য বা প্রতিযোগিতা প্রকাশ পায়। **দ্বিতীয়টি** হচ্ছে যে, ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে শিরকের পথ খুলে যায়। কেননা পৌত্তলিকদের মূর্তি পূজার সূচনা ছবি অঙ্কনের মাধ্যমেই হয়েছিল বলে প্রমাণিত। এজন্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দাবীই হলো, চিত্র-ছবি যেন প্রসার ঘটতে না পারে।

১। 'তারা একটা অনু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক,' দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সকল চিত্র শিল্পীদের চ্যালেঞ্জ করেছেন। চিত্র অংকনকারীরা তাদের ধারণায় আল্লাহরই সৃষ্টির মত সৃষ্টি করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির মত কেউ সৃষ্টি করতে পারবে না। অতএব এজন্যেই চিত্রকররা নিজেদের কাজকে আল্লাহরই অনুরূপ ধারণা করাতে তারা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড় জালেমে পরিণত।

"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে।"[২] (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذِّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ» (صحيح البخاري، البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ...، ح:٢٢٢٥، ٥٩٦٣، ٧٠٤٢ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، ح:٢١١٠)

"প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতোটি [প্রাণীর] চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।"[৩] (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»(صحيح البخاري، اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة...، ح:٥٩٦٣ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ...، ح:٢١١٠)

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো [প্রাণীর] চিত্র অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে পরবে না।"[৪] (বুখারী ও মুসলিম)

২। চিত্রাংকনে সাদৃশ্য জ্ঞাপন দুই কারণে মহা কুফরী হয়ে থাকে। প্রথমঃ কোন চিত্র শিল্পীদের যদি জানা থাকে যে, তার ছবির পূজা করা হবে তবে উক্ত চিত্র শিল্পী কাফের বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়ঃ চিত্রকর কোন চিত্র তৈরি করে এ ধারণা রাখে যে, তার বানান চিত্র আল্লাহর বানান জিনিস থেকেও উত্তম। উক্ত দু'প্রকার ব্যতীত অন্যভাবে যেমন- হাত দ্বারা অংকন বা খোদাই করে চিত্র বানান কুফরী নয়, যার ফলে মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। তবে অবশ্যই কবীরা গুনাহ এদের প্রতি অভিশাপ ও জাহান্নামের হুশিয়ারী রয়েছে।

৩। 'কিয়ামতের দিন তাকে এ চিত্রে আত্মা দেবার জন্য বাধ্য করা হবে', তবে বুঝা যায় যে উল্লেখিত শাস্তি শুধুমাত্র কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কনের ব্যাপারেই।

৪। 'অথচ আত্মা দিতে সক্ষম হবেন না' কেননা এটা তো শুধু আল্লাহ্ই ক্ষমতা রাখেন।

আবুল হাইয়াজ আসাদী (রহঃ) বলেন, আলী (رضي الله عنه) আমাকে বলছেনঃ

«أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لاَ تَدَعْ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُّشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ»(صحيح مسلم، الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ح:٩٦٩)

"আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূল (ﷺ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হলো, 'তুমি কোনো চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর কোনো উঁচু কবরকে [মাটির] সমান না করে ছাড়বে না।"[৫] (মুসলিম)

৫। এই হাদীসে চিত্র ও ছবি বানান হারামের আরো একটি কারণ দর্শানো হয়েছে তা হলো, এটি শিরকের মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত। আর এ হাদীসে রাসূল (ﷺ) উচ্চ কবর ও চিত্র- ছবিকে এক সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন ভাবে উচ্চ করব শিরকের মাধ্যম হয়ে থাকে অনুরূপ ছবি-চিত্র ও শিরকের মাধ্যম। এজন্যই হুকুম দেয়া হয়েছে যে কোন প্রতিমূর্তি ও উচ্চ কবর যেন না থাকে। উচুঁ কবর অবশিষ্ট থাকা শিরকের একটি বিরাট মাধ্যম অনুরূপ চিত্র বা ছবি ও অবশিষ্ট থাকা শিরকের একটি বিরাট মাধ্যম।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। চিত্রকরদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা।

২। কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী।

৩। সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা। তাই আল্লাহ্ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অনু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরি করে নিয়ে এসো।'

৪। চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫। চিত্রকর যতোটা [প্রাণীর] ছবি আঁকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততোটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

৬। অঙ্কিত ছবিতে রূহ্ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭। [প্রাণীর] ছবি পাওয়া মাত্রই ধ্বংস করার নির্দেশ।

অধ্যায়-৬১

অধিক কছম খাওয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ﴾

অর্থঃ "তোমাদের শপথসমূহকে হেফাযত করো।" (সূরা মায়েদাঃ ৮৯)

আবু হুরাইরা (ﷺ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) কে একথা বলতে শুনেছিঃ

«اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِّلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِّلْكَسْبِ» (صحيح البخاري، البيوع، باب "يمحق الله الربوا ويربي الصدقت"، ح:٢٠٨٧ وصحيح مسلم، المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، ح:١٦٠٦)

"[অধিক] শপথ, সম্পদ বিনষ্টকারী এবং উপার্জন ধ্বংসকারী।"[১] (বুখারী ও মুসলিম)

সালমান (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

«ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَّعَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ، وَّرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينِهِ»(معجم الكبير للطبراني، رقم:٦١١١)

"তিন প্রকার লোকদের সাথে আল্লাহ্ পাক ['কিয়ামতের দিন'] কথা বলবেন না, তাদেরকে [গুনাহ্ মাফের মাধ্যমে] পবিত্র করবেন না ; বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ জিনাকারী, অহংকারী

---

* অধিক মাত্রায় কসম খাওয়া তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদকে পূর্ণ করতে পেরেছে সে কখনো কসম-শপথের সময় আল্লাহকে সামনে আনে না। যদিও কথায় কথায় অনর্থক কসম খাওয়াতে মাফ রয়েছে, তারপরেও তাওহীদপন্থীর জন্য বেশী বেশী কসম করা থেকে মুখ ও অন্তরকে মুক্ত রাখা মুস্তাহাব।

১। 'উপার্জন ধ্বংসকারী এটিও একটি শাস্তি, কেননা সে কছম দ্বারা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বর্ণনার ইচ্ছা করে নাই। বরং সম্পদ বিক্রয়ই তার উদ্দেশ্য।

গরীব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে আল্লাহ[২] বানিয়েছে অর্থাৎ কসম করা ব্যতীত সে পণ্য ক্রয়ও করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করে না।" (তাবরানী)

ইমরান বিন হুসাইন (ﷺ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»(صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي ﷺ . . .، ح:٣٦٥٠ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ح:٢٥٣٥)

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। ইমরান বলেন, 'রাসূল (ﷺ) তাঁর পরের দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছি না। অতপর তিনি [রাসূল (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের পরে এমন একজাতি আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে ; কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে।" (বুখারী)

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»(صحيح

২। 'যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী চাপাকে আল্লাহ বানিয়েছে'; সে ব্যক্তি ঘৃণিত ও কবীরা গুনাহ্‌গার বলে গণ্য হবে।

البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي. . .، ح:٣٦٥١ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ح:٢٥٣٣)

"সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।" [অর্থঃ কসম ও সাক্ষ্যের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইব্‌রাহীম নাখয়ী বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন।[৩]

৩। 'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন' দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের সালফে সালেহীন তাদের সন্তানদের আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান ও বড়ত্ব প্রদর্শনের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিতেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। কসম-শপথ রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।

২। মিথ্যা কসম বাণিজ্যিক পণ্যের রীতি করে, রোজগারের বরকত (প্রসাদ) নষ্ট করে।

৩। যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করে না তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৪। স্বল্প কারণেও গুনাহ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৫। বিনা প্রয়োজনে কসমকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

৬। রাসূল (ﷺ) কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।

৭। সাক্ষ্য না চাইলেও তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে এমন লোকের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন।

৮। মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সালফে-সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

অধ্যায়-৬২

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিষয়*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করবার পর তা ভঙ্গ করো না ; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"[১] (সূরা নাহ্লঃ ৯১)

বুরাইদাহ্ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ছোট হোক, বড় হোক [কোনো যুদ্ধে] যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাকওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকতো তাদেরকে উত্তম উপদেশ দিতেন এবং বলতেনঃ

«اُغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلٰى ثَلٰثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ، فَأَيَّـتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلٰى دَارِالْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَّا

---

* আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারীর অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি দেয়া।

১। 'আল্লাহ্র নামে তোমরা যখন কোন শক্ত ওয়াদা করো তখন তা পুরা করো' আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, মানুষের মাঝে লেন-দেনের সময় আল্লাহ্র নামে যে কসম খাওয়া হয় তা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্র প্রতি বড়ত্ব ও সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক সে ওয়াদা বা চুক্তি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব এবং উক্ত প্রকার ওয়াদা পূর্ণ না করার অর্থ আল্লাহ্কে অবজ্ঞা ও হেয় করা।

لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لاَ»(صحيح مسلم، الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ح:١٧٣١)

“তোমরা আল্লাহ্‌র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমরা যুদ্ধ করো, তবে বাড়াবাড়ি করোনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করো না। তোমরা শত্রুর নাক-কান কেটোনা বা অঙ্গ বিকৃত করোনা। তুমি যখন তোমার কাফের শত্রুদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাবে। যে কোনো একটি বিষয়ে তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। অতপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো। যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করবে। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য অর্থাৎ হিজরত করার জন্য আহ্বান জানাও। হিজরত করলে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দাও, ‘মুহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা

হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুঈনদের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম [বিধি-নিষেধ] জারি হবে। তবে 'গণিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ মুলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ ব্যতীত পাবে না। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। কিন্তু যদি তারা কর দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

তুমি যদি কোনো দূর্গের লোকদেরকে অবরোধ করো, আর দূর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখে দাও।[২] তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখো না বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মাদারী রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দূর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো। আর তারা যদি আল্লাহ্‌র হুকুমের ব্যাপারে তোমার সম্মতি চায়, তবে তুমি আল্লাহ্‌র ফায়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি দিওনা; বরং তোমার নিজের ফয়সালার ব্যাপারে সম্মতি দিও। কারণ তুমি জাননা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফায়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা। (মুসলিম)

২। 'যে সব শত্রুদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারীর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে সব অবস্থা থেকে দূরে থাকা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা এসব অবস্থায় যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয় তখনই মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের জিম্মাদারীর পবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌র সম্মানকে ক্ষুন্ন করা হয়।' অত্র হাদীসের তাওহীদ বাদী ও দ্বীনিই ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যে তারা যেন এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকে যে, আল্লাহ্‌র বড়ত্ব প্রদর্শন যেন কোনরূপ ক্রটি না হয়। কেননা আজকের এ সংশয় ও ফেত্‌নার যুগে সাধারণ মানুষ তোমার মত সুন্নাত ও তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখবে যে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের ব্যাপারে তুমি, কতটুকু শ্রদ্ধাশীল, ফলে তোমার দেখা দেখি তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি বড়ত্ব ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শপথ করা, আল্লাহর যিম্মাদারীর প্রতিশ্রুতি অথবা সাক্ষ্য দেয়া বা সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা এ সবের ক্ষেত্রে আলেম-উলামা ও দ্বীনদারদের জন্য সামান্য অসতর্কতার ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঘাটতি বা ক্ষতি দেখা দিতে পারে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মু'মিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।

২। দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৩। আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৫। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৬। আল্লাহ্‌র হুকুম এবং আলেমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।

৭। সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফায়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহ্‌র হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

অধ্যায়-৬৩

আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম* করার পরিণতি

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»(صحيح مسلم، البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله، ح:٢٦٢١)

"এক ব্যক্তি বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করবো না।' একথা বলে দেয়ার স্পর্ধা কার আছে?[১] আমি তাকে ক্ষমাই করে দিলাম। আর তোমার [কসমকারীর] আমল বাতিল করে দিলাম।" (মুসলিম)

আবু হুরাইরা (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, 'যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা

---

* আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কছম দু'প্রকারঃ প্রথমটি আল্লাহ্‌র উপর মাতব্বরী অহংকার ও হঠকারীতার বশীভূত হয়ে, যেন সে মনে করে যে তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর হক বা বাধ্যবাদকতা রয়েছে এবং সে যেটাকে ভালো মনে করে আল্লাহ্ সেটাই ফয়সালা দিবেন। এটা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী এবং কখনও তাওহীদের মূলনীতিরও পরিপন্থী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করা বিনীতভাবে এবং তাঁর প্রতি ভীত ও মুখাপেক্ষী হয়ে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র এমন অনেক বান্দা রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কছম খেয়ে ফেলেন আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের কসমকে পূর্ণ করে দেন।) এটা মূলতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভাল ধারণার ফলশ্রুতিতে এমন হয়ে থাকে।

১। 'আমি অমুককে ক্ষমা করবো না' একথা বলে দেয়ার স্পর্ধা কার আছে?' এখানে অমুককে ক্ষমা করবো না বলতে একজন পাপী বান্দার ব্যাপারে বলা হয়েছে যার ব্যাপারে জনৈক আবেদ আল্লাহ্‌র উপর মাতব্বরী করে ও দাম্ভিকতাবশত এ ধারণা করেছিল যে, সে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে এরূপ কামালিয়াতে পৌছেছে যে, আল্লাহ তায়ালার কৃত কর্মেও তার নিজস্ব কর্তৃত্ব চলতে পারে। তাই সে যা আকাঙ্খা করবে তাই মিলবে তা প্রত্যাখ্যান হবে না। অথচ এ ধারণা সরাসরি আল্লাহর তাওহীদের পরিপন্থী, সুতরাং সে বলেছিলো যে আল্লাহ্ তোমাকে কোনদিনও ক্ষমা করবেন না, ফলে আল্লাহ্ উক্ত পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছিলেন ও উক্ত আবেদ ব্যক্তির সমস্ত আমল বাতিল করে দিয়েছিলেন। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও তাওহীদ পরিপন্থী কার্যকলাপ ভয়াবহ বিপদজনক।

বলেছিল, সে ছিল একজন 'আবেদ'। আবু হুরায়রা বলেন ঐ ব্যক্তি তাঁর একটি মাত্র কথার দ্বারা তাঁর দুনিয়া এবং আখেরাতের আমল বরবাদ করে ফেলেছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে অহংকারবশতঃ মাতব্বরী করার ব্যাপারে হুশিয়ারী।

২। আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

৩। জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।

৪। এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করতে পারে।

৫। কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

অধ্যায়-৬৪

আল্লাহর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির নিকট সুপারিশ কামনা হারাম*

জুবাইর বিন মুতয়িম (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) এর কাছে একজন আরব বেদুঈন এসে বললো, 'হে আল্লাহ্ রাসূল (ﷺ), আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহ্র মাধ্যমে সুপারিশ করছি, আর আল্লাহ্র কাছে আপনার মাধ্যমে সুপারিশ করছি। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) বলতে লাগলেন, সুব্হানাল্লাহ্, সুব্হানাল্লাহ্, এভাবে তিনি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন, যে তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় রাগতভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেনঃ

«وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ»(سنن أبي داود، السنة، باب في الجهمية، ح:٤٧٢٦)

"তুমি ধ্বংস হও, আল্লাহ্র মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছো আল্লাহ্র মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহ্র মাধ্যমে সুপারিশ করা যায় না।"[১] (আবু দাউদ)

---

* আল্লাহ্কে উসীলা-মাধ্যম বানানো তাঁর কোন সৃষ্টির নিকট জায়েয নয়, চরম বেয়াদবী ও তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

১। কোন মাখলুকের কাছে আল্লাহ্কে উসীলা বানানো আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী কারণ যাকে উসীলা বানানো হয় তার চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে সে ব্যক্তি সম্মানিত হয় যার নৈকট্য লাভের জন্য উসীলা বানানো হয়েছে অথচ আল্লাহ্র তুলনায় মাখলুক কতই না তুচ্ছ ও মর্যাদাহীন। এই জন্যই উক্ত বেদুঈনের কথা শুনে নবী (ﷺ) বার বার "সুবহানাল্লাহ" বলেন এবং সাব্যস্ত করেন যে এসব কুধারণা ও বিষয় থেকে আল্লাহ পূত পবিত্র ও মহান এবং তিনি সমস্ত অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যখন বেদুঈন বললঃ "আপনার কাছে আল্লাহকে সুপারিশকারী হিসাবে পেশ করছি"- তখন নবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ।

২। এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, যার কারণে রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩। نستشفع بك على الله [আমরা আল্লাহ্র কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি'] এ কথা রাসূল (ﷺ) প্রত্যাখ্যান করেননি।

৪। 'সুবহানাল্লাহ্' এর তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা, যে আশ্চর্য ও প্রতিবাদের সময় এ বাক্য বলতে হয়।

৫। মুসলমানগণ নবী (ﷺ) এর জীবদ্দশায় আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন করতেন।

অধ্যায়-৬৫

রাসূল (ﷺ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন বিষয়

আব্দুল্লাহ্ বিন আশ্‌শিখ্‌খির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

«انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا فقَالَ: السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ-أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ-وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»(سنن أبي داود، الأدب، باب في كراهية التمادح، ح:٤٨٠٦ ومسند أحمد:٤/ ٢٤، ٢٥)

"আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম " سـيد " [আপনি আমাদের প্রভু] তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, " السـيد " [আল্লাহ্ পাকই হচ্ছেন প্রভু]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।[১] এরপর তিনি বললেনঃ "তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করতে না পারে।"[২] (আবু দাউদ)

১। নবী (ﷺ) যদিও (বনী আদম সম্রাট) তথাপি তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের পথ প্রতিরোদের কারণে তাঁকে সাইয়্যেদ বলা থেকে নিষেধ করেছেন। উলামায়ে কেরাম, উল্লেখ করেছেন যে কোন ব্যক্তিকে আস্‌সাইয়্যেদ (অর্থাৎ আলিফ লামসহ) বলা মারাত্মক অপরাধ, কেননা এতে ব্যাপকতার অর্থ বিদ্যমান আছে বলে দেখা যায় অনেক লোক কতিপয় অলী যেমন সাইয়্যেদ বাদভীকে আস্‌সাইয়্যেদ বলে আখ্যায়িত করে এবং তাঁর সম্মানে সীমালংঘন করে।

২। কারো মুখোমুখি প্রশংসা ও গুণকীর্তন শয়তানী আচরণ এতে অনেক সময় মনের মাঝে অহংকার ও বড়ত্ব জন্ম নিতে পারে, যার ফলে তার জন্য আসবে লাঞ্ছনা, কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকেই একমাত্র তাওফীক দাতা ও সকল শক্তির উৎস মনে করবে না, নিজের হঠকারীতার কারণে সে অবশ্যই অপমানীত হবে লাঞ্ছিত হবে। ফলে নবী (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, শয়তান যেন তোমাদের উপর বিজয়ী না হতে পারে।

আনাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোক রাসূল (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বললো, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আমাদের প্রভু তনয়' তখন তিনি বললেনঃ

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ»(عمل اليوم والليلة للنسائي، ح:٢٤٨، ٢٤٩ ومسند أحمد:٣/ ١٥٣، ٢٤١، ٢٤٩)

"হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি 'মুহাম্মাদ' আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ্ পাক আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর ঊর্ধ্বে আমাকে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করি না।"[৩] (নাসায়ী)

৩। তারা নবী (ﷺ) কে যে গুণে গুণান্বিত করেছিল প্রকৃত পক্ষে সে গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তিনি শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য উক্ত কথা বলেন, যাতে করে তার ফলে শিরক স্থান না পায়। সুতরাং যখন কেউ কারো সম্মান ও বড়ত্ব প্রকাশ করবে তখন শয়তান তাদের উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের অন্তরকে এমন বানিয়ে দিবে যে সম্মান প্রদানকারী শিরক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে যেভাবে তার সম্মান প্রদান বৈধ নয় সে সেভাবে তা প্রদান করবে। তাই কাউকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করলে পর্যায়ক্রমে সেটা শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। ফলে নবী (ﷺ) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর ঊর্ধ্বে আমাকে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করিনা।' এ অধ্যায়টি শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার যাবতীয় মাধ্যমকেও বন্ধ করে দেয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বর্ণিত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ।

২। 'আপনি আমাদের প্রভু বা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিত, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩। লোকেরা রাসূল (ﷺ) এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, 'শয়তান যেন তোমাদের উপর চড়াও না হয়।' অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধাবন করা।

৪। রাসূল (ﷺ) এর বাণী– অর্থাৎ তোমরা আমাকে আমার স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করিনা। একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

অধ্যায়-৬৬

আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব এবং উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

﴿ وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾

অর্থঃ "তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (সূরা যুমার, আয়াতঃ ৬৭)

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পণ্ডিত রাসূল (ﷺ) এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মাদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ পাক সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজীকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।' এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) ইহুদীয় পণ্ডিতের কথার সমর্থনে এমনভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াতটুকু পড়লেনঃ

﴿ وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾

অর্থঃ "তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (সূরা যুমার, আয়াতঃ ৬৭)

মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে থাকবে, তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমিই রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ্।'

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। বুখারী ও মুসলিম

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) মারফু হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

«يَطْوِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ السَّبْعَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟»(صحيح مسلم، صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار، ح:٢٧٨٨)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতপর সেগুলোকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, 'আমি হচ্ছি শাহানশাহ [মহারাজা]। অত্যাচারী আর জালিমরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?" (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

«مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ»(تفسير ابن جرير للطبري: ٢٤/ ٣٢)

"সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ্ পাকের হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষার দানার মতো।"

ইবনে যায়েদ বলেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ قَالَ: وَقَالَ أَبُوذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِّنَ الأَرْضِ»

(تفسير ابن جرير للطبري، خ:٤٥٢٢ والأسماء والصفات للبيهقي، ح:٥١٠)

"কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যে, একটি ঢালের মধ্যে নির্দিষ্ট সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মতো।" তিনি বলেন, আবু যর (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রাসূল (ﷺ) কে এ কথা বলতে শুনেছিঃ "আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূ-পৃষ্ঠের কোনো উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো।"

ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

«بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَآءٍ وَّسَمَآءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَّبَيْنَ السَّمَآءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَّبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَآءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَّالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ»(أخرجه الدارمي في الرد علي الجهمية، ح:٢٦ وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ح:٥٩٤، والطبراني في المعجم الكبير، ح:٨٩٨٧)

"দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। এমনিভাবে সপ্ত'ম আকাশ ও কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ, আর আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ্ পাক রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নাই।" হাদীসটি ইবনে মাহ্দী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যির্‌র হতে এবং যির্‌র আব্দুল্লাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবি ওয়ায়েল হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

আব্বাস রিন আব্দুল মুত্তালিব (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

«هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَّمِنْ كُلِّ سَمَآءٍ إِلٰى سَمَآءٍ مَّسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَّكَثْفُ كُلِّ سَمَآءٍ مَّسِيرَةُ خَمْسِمائَةِ سَنَةٍ، وَّبَيْنَ السَّمَآءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ فَوْقَ ذٰلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ»(سنن أبي داود، السنة، باب في الجهمية، ح:٤٧٢٣ ومسند أحمد:١/٢٠٦، ٢٠٧)

"তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?' আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, 'আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশ বছরের পথ। সপ্তম আকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ্ পাক এর উপরে রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকাণ্ডই তাঁর অজানা নয়।" (আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থ।)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ﴾ এর তাফসীর।

২। এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের রাসূল (ﷺ) এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকারও করতো না এবং অপব্যাখ্যাও করতো না।

৩। ইহুদী পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্র ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বললো, তখন রাসূল (ﷺ) তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কোরআনের আয়াত ও নাযিল হলো।

৪। ইহুদী পণ্ডিত কর্তৃক আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল (ﷺ) এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

৫। আল্লাহ্ পাকের দু'হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট ঘোষণা। নিশ্চয়ই তাঁর ডান হাত হবে আকাশমন্ডলী ও বাম হাতে হবে যমীনসমূহ।

৬। অপর হাতকে বাম হাত বলে নামকরণ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৭। কিয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহ্র হুঙ্কার।

৮। 'তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মতো' রাসূল (ﷺ) এর এ কথার তাৎপর্য।

৯। আকাশমন্ডলীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১০। কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১। কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২। প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩। সপ্তামাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪। কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫। আরশের অবস্থান পানির উপরে।

১৬। আল্লাহ্ পাক আরশের উপরে।

১৭। আকাশ ও যমীনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮। প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরো) পাঁচশ' বছরের পথ।

১৯। আকাশমণ্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার ঊর্ধ্ব দেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ।

গ্রন্থখানির মহামতি প্রণেতা শাইখুল ইসলাম (রহঃ) অত্র অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এ বইটির ইতি টেনেছেন যা মূলতঃ অতি উত্তম ও মহান পন্থায় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এ অধ্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তার মর্যাদা, জালালাত এবং তাঁরই মহাশক্তির যে বর্ণনা রয়েছে সে ব্যাপারে যে জ্ঞান লাভ করবে সে মহান রবের একান্ত বিনয়ী ও প্রকৃত আনুগত্যে নিজেকে উৎসর্গ করবে। এ বাস্তবতার উপর অনেক প্রমাণাদি এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা তাঁর এসব মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীই হচ্ছে, তিনি যে একক মা'বূদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।' আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি" অর্থাৎ আল্লাহ্ যে মর্যাদা ও বড়ত্বের অধিকারী বান্দা তা তাঁকে দিতে পারেনি অন্যথায় তারা তাঁর ব্যতীরিকে অন্য কারো ইবাদত বা উপাসনা করত না। যখন তুমি তোমার পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় রবের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে তখন জানতে পারবে যে, তিনি মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী আরশের উপর উন্নীত। এই প্রশস্ত ও বিশাল জগতে তাঁরই আদেশ ও নিষেধ বলবৎ রয়েছে, এ জগতে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অফুরন্ত রহমত ও নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। যার থেকে ইচ্ছা বালা-মুসিবত দূর

করেন। তিনিই যাবতীয় অনুগ্রহ ও অবদানের মালিক। তুমি জেনে রাখ আকাশ মন্ডলীতে তাঁরই কর্তৃত্ব এবং আকাশ মন্ডলী ফেরেশ্তারাজী তাঁরই ইবাদতে মশগুল ও তাঁরই দিকে তাদের যাবতীয় প্রবণতা। তাঁর বিশাল রাজত্ব আকাশমণ্ডলীতে তাঁর পুরা কর্তৃত্ব বিদ্যমান, সত্ত্বেও তোমার মত এক নগন্য ও তুচ্ছের প্রতি সম্বোধন করে ইবাদতের আদেশ করেন, এতে কি তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে না? তেমনি তোমাকে তাকওয়া অর্জনের হুকুম দেন, যদি তোমার বুঝ থাকে তবে তুমি এতে ধন্য। তুমি যদি আল্লাহ তায়ালার হক বুঝতে পার এবং তাঁর উচ্চগুণাবলীর জ্ঞান হয় তবে তুমি অবশ্যই তাঁর বশ্যতা অনুগত্য প্রকাশ না করে থাকতে পারবে না। ফলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারলে তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা চালাবে এবং যখন তুমি তাঁর কালাম তেলাওয়াত করবে তখন দেখবে যে মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমার সেই আগের সম্মান, মর্যাদা ও বড়ত্বের ব্যাপারে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আল্লাহ্র বড়ত্ব বর্ণনা এবং তাঁর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বিশাল রাজত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করা। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাপ্ত

غاية المريد في شرح كتاب التوحيد

(باللغة البنغالية)

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউইয়র্ক

ISBN: 9960-732-10-X